পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ইতিহাস আলোচনা: পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনির্ভরগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সমীক্ষা;

এম. ফিল (ইতিহাস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্রের অভিসন্দর্ভ

রামকৃষ্ণ জানা

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৯

ক্রমিক সংখ্যা: ০০১৭০০৬০৩০১৯

পরীক্ষার অনুক্রম: MPHS194019

রেজি, নং: ১৪২৩৩০ (২০১৭-২০১৮)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০১৯

DECLARATION

I, RAMKRISHNA JANA, (Class Roll No-001700603019; Examination Roll No- MPHS194019; Reg No- 142330 of 2017-2018) do hereby declare that the dissertation entitled “ পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ইতিহাস আলোচনা: পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনির্ভরগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সমীক্ষা;” has been prepared entirely by me under the guidance of Dr. Bijaya Kumar Das. Professor. Department of International Relation. Jadavpur University. Kolkata-700032.

I here declare that this work is original and has not been submitted in part or full to any other Universities or Institute for the award of any Degree or Diploma.

....

Supervisor

Dr. Bijaya Kumar Das

Associate Professor

Department of International Relation

Jadavpur University

Kolkata- 700032

....

Candidate

Ramkrishna Jana

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

“পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ইতিহাস আলোচনা: পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনির্ভরগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সমীক্ষা;” এই গবেষণাপত্রটি লেখার জন্য আমি নানা সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মানুষের কাছে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। আমার এই গবেষণাপত্রটির তত্ত্বাবধায়ক হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিজয় কুমার দাস। আমার এই সমগ্র গবেষণাটি সম্পাদনের উৎসাহ, উপদেশ, পরামর্শ ও নির্দেশনা দান করার জন্য আমি আমার যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ রূপ কুমার বর্মণ স্যারের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণা তো দূরে থাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হত না যদি আমার পরিবার বিশেষ করে, আমার মা ও বাবা আমাকে সহযোগিতা না করতেন বা সবসময় পাশে থেকে উৎসাহিত না করতেন। অনেক পারিবারিক বাধা অতিক্রম করেও কিন্তু আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনদিন কৃপণতা করেন নি। আমি তাদের সকলের কাছে আমার অন্তর থেকে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি কৃতজ্ঞ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ডঃ সুভাষ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে। আমি যখন এম.এ করি তখন থেকে স্যার আমাকে গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করতেন। বিভিন্ন সেমিনারে লেখা জমা দেওয়ার জন্য স্যার সবসময় নিজের অমূল্য সময় ব্যয় করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এমনকি আমি এই বিষয়ে গবেষণার জন্য স্যারের উপদেশ নিয়েছি বারবার। এই উৎসাহ-ই আমাকে পরবর্তী কালে এম.ফিল গবেষণার বিষয় নির্বাচনে উৎসাহ দান করেছে।

আরও যাদের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ তারা হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ডঃ নুপুর দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা ব্যানার্জি, অধ্যাপিকা ডঃ মহুয়া সরকার, অধ্যাপিকা ডঃ সুদেষ্ণা ব্যানার্জি, অধ্যাপক ডঃ শুভাশিস বিশ্বাস, অধ্যাপক ডঃ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রমুখ।

এছাড়াও আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ (কল্যাণী) সুস্মিতা চৌধুরী মহাশয়া ও গান্ধী ভবনের লাইব্রেরিয়ান স্যারদের কাছে আমি বারবার সাহায্য নিয়েছি। ওনারা নিজেদের ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে বিশেষ সময় দিয়ে সমস্ত পত্রিকাগুলি দেখিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতির সম্পাদকের কাছে। উনি আমাকে আমার গবেষণার বিষয়ে যথার্থ সাহায্য করেছেন। তাই এনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়াও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আধিকারিকরা আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এবং পত্রপত্রিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আমার এই দীর্ঘ গবেষণাপর্বে আমার বন্ধু সুজয় ও পীযুষ, পার্থ, অলোক দা, আমার বান্ধবী রিঙ্কি, ভাই শ্রীকৃষ্ণ-এদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান গবেষণা পত্রটি হয়তো পূর্নাঙ্গ রূপ পেত না। এছাড়াও আমাকে আমার অনেক বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাদেরকেও জানাই আমার অসংখ্য ধন্যবাদ।

রামকৃষ্ণ জানা,

মে, ২০১৯।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ-

ভুমিকাঃ- ১-২৪

প্রথম অধ্যায়ঃ- মনীষীদের ভাবনায় সমবায় চিন্তা ও সমবায় আন্দোলন ২৫-৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ-পশ্চিম মেদিনীপুর ও স্বনির্ভরগোষ্ঠী ৭৫-১১২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ-স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন ১১৩-১৩৮

উপসংহারঃ মুল্যায়ন ও সুপারিশঃ- ১৩৯-১৪২

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীঃ- ১৪৩-১৫১

ভূমিকা

আমার গবেষণার বিষয় “পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ইতিহাস আলোচনা: পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনির্ভরগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সমীক্ষা”। এ প্রসঙ্গে সাধারন মানুষের মধ্যে কীভাবে আদিম যুগ থেকে গোষ্ঠী উদ্ভবের ধারনা এসেছে তার ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়াও মানুষের মধ্যে কীভাবে সমবায়ের ভাবনার সঞ্চার ঘটার সাথে সাথে সারা পৃথিবীতে তথা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কীভাবে সমবায়ের আন্দোলনের উদ্ভব হচ্ছে তা আলোচনা করা হয়েছে। সমবায়ের দর্শনকে বিভিন্ন মনীষীরা কীভাবে দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাদেরকে ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন থেকে বাঁচার তাগিদ জুগিয়েছিল স্বদেশীকতায় উদবুদ্ধ করিয়ে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে। এই স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাংলাতে কীভাবে বিভিন্ন দল গঠনের মাধ্যমে সাধারন মানুষকে স্বনির্ভর করার প্রয়াস দেখিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের প্রথম সমবায় আইন হিসাবে ‘কোঅপারেটিভ অ্যাক্ট ১৯০৪’ এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে এই আইনগুলির বিভিন্ন পরিবর্তন ও সুপারিশগুলিও আলোচিত হয়েছে। এরপর আরও দেখানো হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে সমবায়ের সম্বন্ধে কী কী বলা হচ্ছে ? ব্রহ্মপ্রকাশ চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ‘মডেল কোঅপারেটিভ অ্যাক্ট’ কতখানি সমবায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল তার ব্যাখ্যা ও। আবারও আমি ১৯৯০ সালের পরে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সমবায়ের পরিবর্তনকেও সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা করেছি। এই সমবায় ব্যাংকগুলি কীভাবে তাদের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে নাবার্ড ও স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনার আওতায় থাকা স্বনির্ভরগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাও আলোচিত হয়েছে। এই

স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি পশ্চিমবঙ্গ তথা পশ্চিম মেদিনীপুরে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে কীভাবে নিজেদের সামান্য পুঁজিকে একত্রিত করে স্থানীয় ব্যাঙ্কের সহায়তায় নিজেরা স্বনির্ভর হয়ে উঠছে তাও ব্যাখ্যা করেছি। এবং এই স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলারা কীভাবে সমাজে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে তারও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমি দিয়েছি।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদির আলোচনাঃ-

এই গবেষণার প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও তার নিবন্ধসমূহের পর্যালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বিভিন্ন গ্রন্থ ও নিবন্ধগুলি আমাদের স্বনির্ভরগোষ্ঠী বিষয়ক ধারনাকে স্পষ্ট করে এবং বর্তমান গবেষণাকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ওপর কম-বেশি কাজ হলেও আমার জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরের ওপর তেমন কোনো কাজ হয়নি। আমি আমার গবেষণায় নিম্নোক্ত কিছু গ্রন্থকে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় দেশীয় স্তর, তৃতীয়তঃ রাজ্য, জেলা, গ্রাম্য স্তরের আলোচনার মধ্য দিয়ে

আন্তর্জাতিকস্তরে গবেষণা :-

টমাস ফিসার (Thomas Fisher) এবং এম. এস. শ্রীরাম (M. S. Sriram) সম্পাদিত Beyond Micro-credit :putting development back in to Micro – Finance (2002),এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, ক্ষুদ্রপুঁজি কীভাবে মানুষের দারিদ্র্যতাকে কাটিয়ে গ্রামীণ উন্নয়ন ঘটাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে গ্রামীণ মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও বৃহত্তর সামাজিক সমূহের কী কী পরিবর্তন হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়গুলি। দ্বিতীয় পর্বে,

ক্ষুদ্রপুঁজি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলি বিষয়ে মোট 6 টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথমেই আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন স্বনির্ভরগোষ্ঠী বিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা। পরবর্তি অধ্যায়গুলিতে উন্নয়ন ও সুস্থায়ীত্তের প্রশ্নে, এদেশের ক্ষুদ্রপুঁজি ব্যবস্থায় কাজের ভালোমন্দ মূল্যায়ন ও তার মাত্রা নির্ধারণের সমস্যাগুলি। এই ক্ষুদ্রপুঁজির ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি দিকের ও নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব বলা যায় যে, এই গ্রন্থে ক্ষুদ্রপুঁজির গ্রামীণ উন্নয়নের ভূমিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গোবিন্দ কেলকার (Gobind Kelkar), দেব নাথন (Deb Nathan) ও রৌনক জাহান (Raunak Jahan) তাদের Redifining Women's saman:Micro Credit and Gender Relation in Rural Bangladesh. (2008) গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কীভাবে গ্রামীণ মহিলারা ক্ষুদ্রঋণকে কাজে লাগিয়ে তাদের সম্মান অর্জনে করেছেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উক্তগবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে আসা মহিলারা কীভাবে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব কল্যাণকে সুনিশ্চিত করে সম্পদের অধিকারী হচ্ছে। পরবর্তী পর্যায়ে, নারীদের আর্থিক পরিবর্তনে তাদের সমাজে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও 'Man as the breadwinner ' ধারণাকে কাটিয়ে তোলে গ্রামের মহিলারা কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করছে। এছাড়াও গ্রামীণ মহিলাদের সম্মান বৃদ্ধির ফলে তারা বাড়ির বাইরে গিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্নভাবে ঋণগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। ফলে নারীরাও পুরুষদের সাথে সাথে সম্পদের আহরণ ও বৃদ্ধিতে সমানভাবে অংশগ্রহন করছে। অবশেষে বলা যায় যে, ক্ষুদ্রপুঁজিগঠনের দ্বারা

গ্রামীণ মহিলার সম্পদ ও সম্মান সর্বক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা বলা ভুল হবে। এখনও কিন্তু অনেক মহিলা যারা কিন্তু স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে যোগদান করেনি তারাও গ্রামীণ উন্নয়নের সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে।

নায়লা কবীর (Naila Kabeer) তাঁর"Is Microfinance a 'Magic Bullet for Women's Empoworment? Analysis of Finding From South Asia "(2005)। এই প্রবন্ধে ক্ষুদ্রপুঁজিসংস্থার মাধ্যমে চলতে থাকা বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক প্রভাবগুলোকে তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন– বাংলাদেশের ক্ষেত্রে Bangladesh Rural Advancement Commitee (BARC), অন্ধ্রপ্রদেশের Society for Helping Awakening Rural Poor through Education (Share), ওড়িশার Centre for youth and Social Development (CYSD). ঝাড়খণ্ডের Professional Assistance for Development Action (PRADA), ইত্যাদি। তিনি উক্তগবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ক্ষুদ্র পুঁজিসংস্থাগুলিকে দরিদ্র্য জনগণের কাছে কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এই সমস্যা সমাধানে সংস্থা কী কী ভূমিকা গ্রহণ করছে। ক্ষুদ্রপুঁজির ভিতর দিয়ে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কতটা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে প্রভৃতি বিষয়গুলি ।

মুহাম্মদ ইউনূস "গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কীভাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু দক্ষতা থাকে, তার সাহায্যে সে কীভাবে দারিদ্র দূর করতে পারে। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, বিশেষকরে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা বাঁশের ঝুড়ি তৈরী করে সাংস্কৃতিক ও আর্থিক বাধাকে এড়িয়ে নিজেদের দারিদ্রের মোকাবিলা করেছে।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে :-

এম. এস. শ্রীরাম তাঁর “Microfinance and the state Exploring Areas and Structure of Collaboration”গ্রন্থে প্রাচীন চিরাচরিত ক্ষুদ্রপুঁজিব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন ধরণের ক্ষুদ্রপুঁজিব্যবস্থার কথা আলোচনা করেছেন। লেখক প্রথমদিকে প্রথাগত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, নাবার্ডের স্বনির্ভরগোষ্ঠী ব্যাংকসংযুক্তি প্রকল্প এবং রাজ্য পরিচালিত স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার, সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও দরিদ্র্য কৃষকদেরকে সমবায় ও গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে কিষান ক্রেডিট কার্ড বিলির বিষয়েও আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে, আর্থিক যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি উন্মোচিত করেছেন এবং ক্ষুদ্রপুঁজির নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তারের সুযোগ সম্পর্কেও আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে আলোচিত হয়েছে, গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা এবং কিছু কিছু পেশাদারি মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামীণ সাধারণ দরিদ্র মানুষকে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়গুলি নিয়েও। শেষে লেখক গ্রামীণ ব্যাংক-এর প্রচলিত নিয়মের যৌক্তিকতা বিচার করেছেন যাতে করে নতুন করে আরও স্থানীয় ব্যাংকগুলি উঠে আসে। তিনি আরও বলেন যে, আর্থিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য অলাভকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে।

মহেন্দ্র. ভার্মান. পি (Mahendra Verman P) তাঁর প্রবন্ধ “Impact of Self-help Groups on Formal Banking Habits”-এ দেখিয়েছেন, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বেশিরভাগ স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সাথে গ্রামীণ মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকার মধ্যে কী সংযোগ ছিল? এর সাথে জনসাধারণের ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতায়র ধরন, স্বনির্ভরগোষ্ঠী বৃদ্ধির সাথে

সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকার সম্পর্ক, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাঙ্কিং অভ্যাসের নির্ধারক সমুহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সবশেষে দেখিয়েছেন, অপ্রথাগত ব্যাঙ্কিং-পরিষেবার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগনের ব্যাঙ্কিং অভ্যাসে কতখানি প্রভাব পড়েছে? আর গ্রামীণ মানুষের ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সাথে যুক্ত হওয়ার স্বনিভরগোষ্ঠীর দলনেত্রীরা কীভাবে কাজ করছে? এই দলনেত্রীর পরিবর্তন হলে স্বনিভরগোষ্ঠীর ওপর কী কী প্রভাব পড়ে সে বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার কে. জি কর্মকার সম্পাদিত “Microfinance in India” 2008, গ্রন্থে ভারতের ক্ষুদ্রপুঁজি বিষয়ে 25 টি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ভারতের দরিদ্র মানুষের আর্থিক প্রয়োজনে কতখানি ভূমিকা পালন করেছে এবং তা নারী-ক্ষমতায়নে কতখানি সহায়ক। এর পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে ক্ষুদ্রপুঁজির মতো প্রতিষ্ঠান গুলিতে কাজ করার পদ্ধতি, গোষ্ঠীর স্থায়িত্ত, গোষ্ঠীসংঘ স্থাপন এবং সমস্যা ও স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনার মাধ্যমে গড়ে ওঠা স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির ভূমিকা ও উল্লেখিত হয়েছে। 1992 সালে নাবার্ডের গোষ্ঠী ব্যাংক মডেলের কথাও আলোচিত। যেমন–Mysore Resettlement and Development Agency-র সংঘমিত্রা, Development of Human Action Foundation-র kalanjian Community Banking Programme, পশ্চিমবঙ্গের বন্ধন (2001) প্রভৃতি। আবার ইন্ডিয়ান ওভারসিস ব্যাংক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Pandyan Grama Bank– স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংযুক্তির মডেল। উত্তরপ্রদেশের আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক হিসাবে, প্রথমা ব্যাঙ্ক, কৃষক ক্লাব মডেল ও মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। অতএব এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের

ব্যাঙ্কের সাথে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের বন্ধন ব্যাঙ্কের কথাও এখানে আলোচিত।

"Microfinance Self-help in India : Living up to Their Promise?" (2009),-এ Frances Shina দেখিয়েছেন যে, কত সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিচ্ছে আর কতসংখ্যক গোষ্ঠীর বাইরে থাকছে, কেনই বা তারা গোষ্ঠীতে যোগদান করছে না। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি কী কী ভূমিকা গ্রহন করছে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির স্থায়ীত্ব কত দিন? গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই বা তারা কী কী ভূমিকা নিচ্ছে। এখানে অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটক এবং উত্তর ভারতের ওড়িশা ও রাজস্থান রাজ্যের মোট 214 টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নমুনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তিনি আলোচনা করেছেন যে, স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে যোগদান করলে যেমন আর্থসামাজিক উন্নতির একটা সম্ভাবনা আছে তেমনি খুব দরিদ্র্য মানুষের ও প্রয়োজনীয় উপার্জনের সম্ভাবনা আছে। আবার সংগঠিত ছাড়াও অসংগঠিত ক্ষেত্রে দরিদ্র্য মানুষ কখনো কখনো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ একজাতিভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির হওয়ার মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক ভূমিকা পালন করে মাত্র 30% মানুষ। স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ভেঙে যাওয়্যার কারনগুলিও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

পাঞ্চালী সেন (Panchali Sen) তাঁর "Self-help Groups and Women in India" গ্রন্থে ভারতবর্ষে মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠী আন্দোলনের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি ভারতের স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। এক হল, জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (NABARD)-এর স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ব্যাঙ্ক সংযুক্তি প্রকল্প এবং অন্যটি হল, দরিদ্র মানুষের

গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY)। এখানে তিনি অনেক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের ওপর ক্ষমতা দেখায় ও চাপ সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির ক্ষমতার ক্ষেত্রে তিনি আলোচনা করেছেন বিশেষত শিক্ষা গ্রহণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, নারী নির্যাতন, জাতপাত সমস্যা, রাজনৈতিক দূরবৃত্তায়ন, সরকারি অদক্ষতার প্রতিবাদ করা অনেক সহজ হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে দারিদ্র্যকে অতিক্রম করার সাথে সাথে ভোটব্যাঙ্কের ব্যবহারের কথাও তিনি বলেছেন।

জয়া. এস. আনন্দ (Jaya S Anand) তাঁর লেখা "Self-help in Empowering Women:Case Study. Of Selected (SHG) and (NHGs)"(2002), গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও তার পাশাপাশি যে প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠেছে তাদের তুলনামূলক আলোচনা। মহিলা ক্ষমতায়নে স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার প্রভাবের ক্ষেত্রসমূহ। গবেষণাটি মুলত কেরালা রাজ্যের ওপর নীলাম্বুর ব্লকের ছাংগারা গ্রামপঞ্চায়েতের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। সেখানে দারিদ্র্য দূরীকরনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি কীভাবে কাজ করছে। তার তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। বিশেষত C.D.S শ্রেয়স ও বন্ধনগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে তাদের প্রাচীনত্ব ও সদস্যভিত্তিক তালিকা ও মহিলা ক্ষমতায়নে এই সংস্থাগুলি কী ধরণের ভূমিকা পালন করছে, তার বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এই স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যরা কীভাবে নানান সমাজ সচেতনতামূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে তাও এই গবেষণাতে দেখিয়েছেন।

লক্ষী রামচন্দ্র (Lakshmi Ramachandra) এবং পি জে পেল্টো (Pertti. J. Pelto) তাঁর “Self-help Groups in Bellary : Microfinance and Women’s Empoworment”(2009), গবেষনাটি মূলত কর্নাটকের বেলারী জেলার গ্রামীণ স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলাদের ক্ষমতায়ন ক্ষুদ্রপুঁজি কী ভূমিকা নিচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে রচিত। এছাড়াও আলোচিত হয়েছে যে, কীভাবে বেলারীর অধিকাংশ স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারা জাতি, ধর্ম ও বৃহত্তর সমাজের সাংস্কৃতিক বাধাগুলিকে কাটিয়ে ওঠে দক্ষতার সাথে কাজ করছেরন যা অন্য গোষ্ঠীগুলির চেয়ে বেশি সক্রিয়। স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের হাতে ক্ষমতা আসায় তাদের পুরুষদের কাছ থেকে নির্যাতিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাচ্ছে। আবার খাদ্য উৎপাদন, পরস্পর সংযুক্তি ও সমন্বয়, দারিদ্র্য দূরীকরনে চিটফান্ড ব্যবস্থার প্রতিরোধে তারা বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে।

বি নারায়ণস্বামী (B. Narayanswami) আর. কে সামন্ত (R. K Samanta) ও কে. নারায়ণ গৌদা (K. Narayan Gouda) লিখিত ‘Self-help Groups :key to Empoworment of Rural Women’(2007). নামক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কর্নাটকে কীভাবে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতায়ন ও আর্থিক পরিবর্তন ঘটছে। এখানে ছয় টি অংশে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কর্নাটকে কিভাবে গ্রামীণ স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে। স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি চাষবাসের সাথেও কীভাবে যুক্তহচ্ছে ব্যক্তিগত-মানসিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়নেও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ভূমিকা কতখানি তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

পিট্টা. ঊষা (Pitta Usha) তাঁর Empoworment of Women and Self-help Groups (2010). গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বনির্ভরগোষ্ঠীও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি আলোচনা

করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কার্যকলাপ, বৈশিষ্ট্য, ঋনের লভ্যতা ও ব্যবহার প্রভৃতি ছাড়াও ভারতবর্ষের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর বিকাশ ও সাফল্যের ধরণ, নমুনা, ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তি ও তার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

টি জে জিথা (T. J. Jitha) তাঁর "Mediating Production, Re-powering Patriarchy : The case of Micro Credit"(2013) এই গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে শুধু নারী ক্ষমতায়ন হচ্ছে তাই নয়, বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদেরও ক্ষমতার আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। কারন হিসেবে দেখাচ্ছেন যে, মহিলারা স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে নাম লেখাতে যাচ্ছে তারা কারো না কারো বাড়ির বউ, মেয়ে, বোন। অতএব তারা বাড়ির কাজ শেষ করে যে অবসর সময়টুকু পাচ্ছে তখন এতে যোগদান করছে আবার দেখা যাচ্ছে যে, স্বনির্ভরতা থেকে অর্জিত অর্থ কিন্তু পরিবারের জন্যও ব্যয় করছে, নিজের জন্য নয়। পুরুষতন্ত্রের এই ভূমিকাকে গবেষিকা বলেছেন 'Subsidised dowry ' হিসেবে। এখানে আবার পুঁজিবাদের সাথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ও গভীরযোগসাজের কথাও তিনি বলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে :-

পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্রঋণ প্রসঙ্গে গ্রামীণ সমাজের ওপর আধারিত "some thoughts on Micro – Credit for Empoworment"(1999). এই গবেষণাটি প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে ক্ষুদ্রপুঁজির প্রয়োজনীয়তা এবং তার পরিকাঠামোর কথাও আলোচনা করেছেন। 'সচেতনা 'নামে দক্ষিণ কলকাতায় গড়ে ওঠা একটি মহিলা বেসরকারি সংগঠনের কাজগুলির ও বিবরণ দিয়েছেন। উক্তগবেষণাটি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনাকরা হয়েছে।

নির্মলা ব্যানার্জি (Nirmala Banerjee) এবং জয়ন্তী সেন (Joyanti Sen) তাদের “The Swarnajayanti Gram Swarojkar Yojana :A Budgetary Policy in Working” (2009),উক্তগবেষণায় (SGSY)প্রকল্পের দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, গ্রামীণ মহিলারা প্রথাগত অনুশীলনের বাইরে বেরিয়ে কীভাবে সরকারি উচ্চ থেকে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত ধাপগুলি সুশৃঙ্খলভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত, এই প্রকল্পগুলি কতটা সাফল্য পাচ্ছে এবং এই প্রকল্পের সাথে পশ্চিমবঙ্গের SGSY এর ত্রূটি গুলি কি কি? উপসংহারে পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, প্রভৃতি জেলার স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কার্যকলাপের মধ্যেদিয়ে কতকগুলি বিষয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন – শব্দবন্ধের অর্থগত অস্পষ্টতা, ভর্তুকি বিষয়ক সমস্যা, আবার গ্রামপর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলির হস্তক্ষেপ ও সমস্যার সৃষ্টি করে। আর এটি দরিদ্র মানুষদের জন্য গঠিত হলে ও বয়স্ক, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংস্থান এতে সেভাবে রাখা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেহেতু বেশিরভাগ স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে সদস্য মহিলা তাই তাদের কাছে এই গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক সুবিধা দিতে গিয়ে তাদের কাজের চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

স্বপন চ্যাটার্জির লেখা ‘স্ব-নির্ভরগোষ্ঠী এবং সমাজ উন্নয়নের নানা দিক’(2004) গ্রন্থে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠন এবং এই গোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং-পরিষেবা ও সরকারিনীতিগুলিকে আলোচনা করেছেন। এই স্বনির্ভরগোষ্ঠীর গঠনের ঐতিহাসিক পটভূমি, সমবায় মডেলের সুবিধা ও তুলনামূলক পর্যালোচনা, তৎকালীন নারীদের সামাজিক অবস্থান, গোষ্ঠী গঠনের আগে ও পরে করণীয় বিষয় কী কী ছিল এবং ঋণ গ্রহণের বিভিন্ন দলিল, সফলতার

কাহিনীগুলোকে এবং নারীদের অধিকার অর্জনও নারী নির্যাতন রুখতে গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন।

মানব সেন (Manab Sen) তাঁর ‘Study of Self-help Groups and Micro Finance in West Bengal’ (2005) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে গ্রামের দরিদ্র মানুষ পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সাহায্যে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এখানে উন্নয়নে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ভূমিকা, দরিদ্র মানুষের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ক্ষুদ্রঋণ কী ভূমিকা নিচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার সাংগঠনিক ধরণ, প্রকল্প রূপায়ণেরনীতি বিষয়ে উক্তগ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গবেষণার জন্য মূলত উত্তর 24 পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের 2000 টি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর 5546 টি পরিবারের সাক্ষাৎকার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণের চাহিদা কতখানি? স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির ক্ষুদ্রঋণের সহায়তা পাওয়ার জন্য ট্রেনিং, এই ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে সাধারণ মানুষ, ব্যাঙ্ক ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা, বিভিন্ন N. G. O ভূমিকা, কেন্দ্রীয় সরকার, R. B. I, NABARD, রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ (RMK), ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (SIDBI) প্রভৃতি ভূমিকা বিষয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাথে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির স্বনির্ভরগোষ্ঠীর তুলনামূলক আলোচনা ও করেছেন।

ড: মানব সেন ও ড: অশোক সরকার ‘Self-help Groups and Micro Finance in West Bengal (A study of Evolution of the SHG-mF sector with special referance to CARE-CASHE)’-এতে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে 2000-2006 সাল পর্যন্ত স্বনির্ভরগোষ্ঠী ক্ষুদ্রপুঁজি ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেছে এবং এর সাথে ‘কেয়ার – ক্যাশে’

প্রকল্পটির ভূমিকা, 2000 সালের পরে এই রাজ্যের প্রভাব কী পড়েছে প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করেছন। গবেষক মাত্র সাতটি বিশেষ জেলার ওপর আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, 1992 সালে ফেব্রয়ারিতে শুরু করেও পশ্চিমবঙ্গে নাবার্ড স্বনির্ভরগোষ্ঠী কতটা সাফল্যের সাথে কাজ করছে। এই প্রকল্প কীভাবে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নে যেমন- বনদফতর, ইচ্ছামতি দুধ ইউনিয়ন ইত্যাদি সংস্থার ক্ষেত্রে সহায়কের কাজ করছে তাও আলোচিত হয়েছে।

"পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অগ্রগতি সমীক্ষা ও সুপারিশ" প্রবন্ধে দেবজানী সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কাজ ও অগ্রগতি বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভরগোষ্ঠী আন্দোলনে সরকারি সংগঠনের তুলনায় বেসরকারি সংগঠনগুলি গ্রামীণস্তরে বেশি নির্ভর হওয়ায় জেলা গ্রামীণ উন্নয়নকোষ এবং শহরের Institute of Local Goverment and Urban cell (DRDC) থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি গবেষণাটি সম্পূর্ন করেছেন। এখানে তিনি গ্রাম ও শহরের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ওপর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি চারটি জেলার সাতটি ব্লককে নির্বাচিত করেছেন এবং সেখানে স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে যোগদানের ফলে গ্রামীণ মানুষের নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, জাত্যাভিমান, পিতৃতান্তরিক আধিপত্য প্রতিরোধ সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের সহযোগিতা, পারিবারিক সমস্যা মেটানো, এছাড়াও স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি কীভাবে সরকারি আধিকারিকদের দক্ষতা ও উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল সে বিষয়ে তিনি ব্যখ্যা দিয়েছেন।

প্রভাত দত্ত ও দীপঙ্কর সিনহা লেখা "Self-help Groups in West Bengal :Challanges of Development and Empoworment"(2008), গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে

স্বনির্ভরগোষ্ঠী আন্দোলনের নতুন ভাবনাগুলিকে পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন-পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভরগোষ্ঠী আন্দোলন এবং এর বৈশিষ্ট্যর সাথে অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা, গোষ্ঠীর সদস্যদের ধরন, প্রকারভেদ, গোষ্ঠীর মাধ্যমে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বর্তমান গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়করে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সুপারিশ করা। এই গবেষণায় উত্তর 24 পরগনা জেলার সন্দেশখালি, ব্যারাকপুর, গাইঘাটা, প্রভৃতি ব্লকের 20 টি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ওপর গবেষণা চালিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ওপর গবেষণাটিতে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে যোগদানকারি ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর বাইরে থাকা মানুষদের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করবো । অনেক স্বনির্ভরগোষ্ঠী আছে তাদেরকে নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও গোষ্ঠীর বাইরে থাকা মানুষদের নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। পুরো গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে Primary Scorce, Secondary Scorce, Interview Method, Observation Method-এর দ্বারা। আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে Table ব্যবহার করবো। অবশেষে গবেষণাটিকে মুলত তিনটি ভাগে ভাগ করবো –

১ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদান করা দরিদ্র মানুষ।

২) স্বনির্ভরগোষ্ঠীর নেতৃত্বদানকারি মানুষ। (সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধক্ষ,)

৩) স্বনির্ভরগোষ্ঠীর বাইরে থাকা মানুষ।

গবেষণাটিতে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমি দেখাবো যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদান করে দরিদ্র মানুষদের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর যারা স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে অংশগ্রহন করেনি তারা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? আবার যারা গোষ্ঠীতে অংশ গ্রহন করছে তারা কী কারণে করছে? আর যারা করছে না তারা-ই বা কী কারণে করছে না তার কারণ গুলোকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো। স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি নারী ক্ষমতায়নে ও সমাজ সচেতনতায় কী কী ভূমিকা নিচ্ছে? তার কারণ, স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে নারীযোগদানে পুরুষদের কোনো ভূমিকা আছে কি না ,এগুলি আমি সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেখাবো। এছাড়াও আমার প্রশ্ন থাকবে যে, বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরে কতগুলি স্বনির্ভরগোষ্ঠী কাজ করে চলেছে। বিশ্বায়নে তাদের কোনো প্রভাব পড়ছে কি না? স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলিতে জাতপাতের ভূমিকা কতখানি? এই গোষ্ঠীর উৎপাদনব্যবস্থা পুঁজি সৃষ্টি করতে পারে কী না? জি, ডি, পি র কত অংশ স্বনির্ভরগোষ্ঠি উৎপাদন করতে পেরেছে? এই স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকাই বা কী? বর্তমানে কতোগুলো গোষ্ঠী উঠে গেছে? প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ।

পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে-সেটা প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যসংগ্রাহক থেকে খাদ্যউৎপাদক. রক্ত-সম্পর্কিত, পেশাগত, জাতিগত এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি সমাজে মানুষকে একসাথে বসবাস করার নির্ভরতা জোগায়। অর্থনীতিগতভাবে সমাজের প্রান্তিকস্তরে থাকা কিছু মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে জীবন ও জীবিকার স্বার্থে যখন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন তাকে স্বনির্ভরগোষ্ঠী বলে। স্বনির্ভরগোষ্ঠী ভারতবর্ষে নতুন হলেও এর শিকড় কিন্তু প্রাক-ব্রিটিশ গ্রামসমাজের মধ্যে প্রোথিত আর প্রাক-ব্রিটিশ গ্রামসমাজের

‘ধর্মগোলাই’ [1]এর ধারাবাহিক রূপ। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ এখনও দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া মানুষকে উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে অদৃশ্য থেকেছে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়েও। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ এই অদৃশ্য অংশকে পরিষেবার আওতায় আনার চেষ্টা করেছে বারংবার আর এদের অসম্পূর্ণতা থেকেই জন্ম নিয়েছে উন্নয়নের মডেল হিসেবে স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি। দেশের বৃহত্তর মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো দেশেরই উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। সক্ষমতা এবং উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। মানুষ নিজের জ্ঞান, শ্রম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের জীবনে নিজেরাই পরিবর্তন আনতে পারে, সহযোগিতা ও বিনিময়ের মাধ্যমে সামাজিক মূলধন সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণও করতে পারে যেটা আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মহম্মদ ইউনুস- এর গবেষণায় দেখেছি। ভারতবর্ষে ১৯৭০-২০০০ বিশেষ করে তিনদশকের মধ্যে গ্রামীণ ভারতবর্ষের সাবেকি ঋণব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটার ফলে পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে স্বনির্ভরপ্রকল্পগুলি জাতপাত ও ধর্মীয় বাধাকে এড়িয়ে উন্নয়নে সামিল হচ্ছে

অষ্ঠাদশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঔপনিবেশিক সরকার বিভিন্ন বিষয় যেমন- অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিকে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ব্রিটিশ সরকার প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিক কাঠামোকে সম্পদ শোষণের মাধ্যমে

---

[1] ধর্মগোলা হল । ধান ওঠার সময় গ্রামের কিছু মানুষ একটি পাত্রে ধান জমা রাখেন, পরে অসময়ে প্রয়োজন মতো সেখান থেকে ধান নিয়ে প্রয়োজন মেটান। অতিরিক্ত ধানের বিনিময় এখান থেকে ধান ঋণ হিসাবে ও দেওয়া হয়। অতিরিক্ত আয় সদস্যাদের মধ্যে সমহারে বণ্টিত হয়। এই ধান জমা রাখার এই পাত্রটিকে গ্রামাঞ্চলে “ধানের গোলা” বলা হয় সেখান থেকেই ধর্মগোলা কথাটার উৎপত্তি।

ভেঙ্গে দিয়েছিল। সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা তারা করেনি। এর ফলে সাধারন কৃষক শ্রমিক শুধু খাজনা বাবদ অর্থ দিয়েই যেত তাদের উদ্বৃত্ত বলে কিছু থাকত না। অর্থনৈতিক দিক থেকে যাকে স্বনির্ভর বলা হয় ব্রিটিশ গ্রামসমাজ সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণ মানুষকে সম্পদের উদ্বৃত্ত শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল। এদেরকে রাষ্ট্রিয় কাঠামোর মধ্যে এনে বিভিন্ন ভাবে শোষণ করা হতো। এদের কাছে খুব কম উদ্বৃত্ত থাকতো বা উদ্বৃত্ত থাকত না বললেই চলে। দিনআনি দিনখাই ভাবে জীবন চলতো শেষে জমিটুকু ও হাতছাড়া হয়ে যেত স্বনির্ভর হতে গেলে যে পুঁজি বা সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন হতো তা এদের ছিল না। সুতরাং ঔনিবেশিক ব্যাবস্থা কখনও স্বনির্ভর হতে দেয়নি। বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির উদহারনে আমরা দেখতে পাই যে, সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ে স্বনির্ভরতার চেষ্টা করছে। যেমন- ওয়েভার কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও মৎস্বজীবি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক গঠন করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তি সময়ে সাধারন মানুষ কিছুটা হলেও দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা ও জমিদারকে খাজনা প্রদান করতে পারে, এই লক্ষ্য। পূর্ববঙ্গের কৃষকপ্রজা পার্টিরউথান এই সময়ে কিছু জনহিতকর কাজ করলেও দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধের জন্য সাধারণ এই উদ্যোগের আশীর্বাদ সাধারন মানুষ পায়নি। যদি ফিসিং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এর কথা ধরা যায় সেক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের চার জন মুসলিম তিন জন হিন্দুর ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্য দিকে ১৯২৯ সালের মন্দা, তার ওপর সাধারন কৃষক ঋণ নিয়ে ঋণ শোধ করতে পারছে না, জুট ও ধানের উৎপাদন কমতে শুরু করেছে, বিশেষত ১৯৩৭-১৯৪০ দশকের এই ঔনিবেশিক নীতি গ্রামীণ অর্থনীতিকে একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। কার্ল মার্ক্স তার 'এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন' 1850,তত্ত্বে কৃষি ও সাবেকি শিল্পের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজন ভিত্তিক অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সহজ সরল গ্রাম সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। ম্যাক্স ওয়েবার এর মতো জার্মান সোশ্যালিস্ট তার 'দ্য রিলিজিয়ন অফ ইন্ডিয়া 'গ্রন্থে বলেন যে, ভারতের জাতপাত তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ভিন্নতাই ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[2] সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, ভারতবর্ষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল জাতপাত, কুসংস্কার ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা প্রভৃতি। আমি কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছি যে, স্বনির্ভরগোষ্ঠী করতে গেলে জাতপাত বাধা হয়ে দাঁড়ালে উন্নয়ন হবে না। সাধারণ মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। আমরা দেখেছি যে, ঔপনিবেশিক আমলে কতগুলো কাস্ট অ্যাসোসিয়েশন(1870),যেমন- নম:শূদ্র কাস্ট অ্যাসোসিয়েশন। এরা কিন্তু স্বনির্ভরগোষ্ঠী হিসাবে কাজ করেছিল। বৈশ্য ব্যাঙ্ক যারা পড়াশোনা করার জন্য ঋণ দিত, এগুলি মূলত জাতি ভিত্তিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ব্যাঙ্ক। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই যে, জাতপাতহীন ব্যাঙ্ক গুলো ও গড়ে উঠেছে যারা কিন্তু গ্রামীণ উন্নয়নে সহায়তা করছে। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্য আমাদের কাছে সঠিক বলে মনে হয় নি। আবার ঐতিহাসিক এইচ এল ফিশার, মিশেল ম্যাকেন, টিম্বার এর মতো ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন মাড়োযারি তাদের ধর্ম ও অনুশাসন কে মেনে তারা কিন্তু ব্যবসা ও বাণিজ্যের জগৎ এ ঔপনিবেশিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তাদের উদ্যোগকে বজায় রেখেছে।

---

[2] Weber Max. (2000) "The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism", Munshiram Manoharlal, pp-120

ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষিসমাজের মানুষের জাতপাতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি তাদের অর্থনীতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি, বাধা হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থা প্রসূত শোষণ। কৃষি কাঠামোর উপরতলা উলম্বভাবে যত বিভাজিত হয়েছে ততই কৃষকদের ওপর খাজনার চাপ বেড়েছে। কৃষক তার আয়ের বড় অংশ জমিদার বা ঊর্ধ্বতন সত্ত্বভোগীর খাজনা মিটিয়ে, মহাজন ও দাদনদারের আর্থিক দায় মিটিয়ে তার কাছে উদ্বৃত্তের যে অংশটুকু পরে থাকত তা দিয়ে তার পক্ষে উন্নত প্রযুক্তি কৃষিকাজে প্রয়োগ করে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। মৎস্যজিবীদের ক্ষেত্রেও বাংলার হিন্দু মৎস্যজিবীরা বিভিন্ন অবজাতিতে (sub-cast) বিভাজিত বলা হয়ে থাকে। উন্নত প্রযুক্তি গ্রহনকরে তারা মৎস্য উৎপাদনে অনীহা দেখাত। তারা সাবেকি উৎপাদনের উৎপাদন পদ্ধতির মতই তারা খালে, বিলে, নদীতে মৎস্য উৎপাদন করে থাকে। তাদের মধ্যে এক অবজাতি অন্য অবজাতির জাল বা নৌকা বা কোনো মৎস্য উৎপাদনের কৌশল গ্রহন করে না।[3] কিন্তু বাস্তবে তা নয়, ঔপনিবেশিক সরকার ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য গ্রামীন কৃষি অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেমন কৃষি উন্নতিতে কৃষি বিজ্ঞান ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা করেছিলেন(লর্ড কার্জন), মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য, মৎস্য গবেষণা, ফার্মিং, জাল, নৌকা যাতে উন্নত করতে পারে তার ব্যবস্থাও করে ছিলেন। কিন্তু সাধারণ কৃষক, মৎস্য জিবী কারিগর একে গ্রহন করেনি, এর পেছনে গ্রামীণ জাতপাতকে বাধা হিসেবে দেখিয়েছে ন। কিন্তু বর্তমান এ বিষয়ে গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে তাদের সংস্কৃতি বাধা নয় তাদের দারিদ্র্যই উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

---

[3] সেন সুভাষ চন্দ্র, ‘বাংলার সাবেকি মৎস্য শিল্প কলা কৌশল ও প্রযুক্তি এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র’ ২০০৭ ইতিহাস অনুসন্ধান- ১৮

এবারে আমরা একটু সাহিত্যের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবো যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে হোসেন মিঞা ময়নাদ্বীপে কুবের ও ধনঞ্জয়দের নিয়ে যখন যাচ্ছেন তখন দূরবীন দিয়ে হোসেন মিঞা ময়নাদ্বীপের দুরত্ব মাপার চেষ্টা করছে। কুবের জিজ্ঞেস করে এটা কি? তখন হোসেন মিঞা বলে – এটা দূরের জিনিস কাছে দেখা যায়, এটার মেলা দাম আমাকে এটা একটা সাহেব দিয়েছিলেন। যখন আমি জাহাজের সারেঙ্গী ছিলাম।[4] এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সমুদ্রের বুকে দূরবীন ব্যবহারের সংস্কৃতিগত বাধা ছিল না। ছিল আর্থিক বাধা। দীপক কুমার তাঁর ‘সায়েন্স অ্যান্ড দ্য রাজ’ গ্রন্থে বলেছেন যে, বঞ্চিত মানুষকে উন্নয়নের সাথী না করাটা হচ্ছে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। আর সেই ব্যর্থতা ঢাকার জন্যেই রাস্ত্র বা শাসক শ্রেণী সে দেশী হোক বা বিদেশী হোক জাতপাতকে ব্যবহার করে তাদের বঞ্চনার চেষ্টা করে।[5] স্বাধীনতার উত্তর কালে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা গুলি হল:-

১) সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি সহযোগিতা গুলি সমানভাবে না পৌঁছানো।

২) কিছু সুবিধাভোগী মানুষের দুর্নীতি

৩) ওপর তলার মানুষের তথা উঁচু জাতির লোকের নিচু তলার তথা দলিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি অবজ্ঞা।

---

[4] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, –“**পদ্মা নদীর মাঝি**” **১৯৩৬**, **এন্টারপ্রাইজ**, **কলকাতা**। পৃ ২৮

[5] **দীপক কুমার**, -“**সায়েন্স অ্যান্ড দ্য রাজ : এ স্টাডি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া**” **১৮৫৮-১৯০৫**, অক্সফোর্ড **পাবলিকেশন্স**। ২০০৬ পৃ ৬৭

উন্নয়ন-ই একমাত্র সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে মুছে ফেলতে পারে। কুসংস্কারদুর করতে পারে। তাই সকলকে উন্নয়নের সাথী করতে গেলে যা প্রয়োজন তা হল জি ,ডি, পি এর একটা বৃহত্তম অংশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এর সুসম বন্টন। এটা যে রাষ্ট্র ব্যবহার করে সে রাষ্ট্রের নাগরিক তত উন্নয়নের সাথী হয়।

বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলোর উত্থানের কথা জানা যায়। বিশেষত ভারতবর্ষের প্রথম কোঅপারেটিভ ব্যাংক হল গুজরাটের বরদাতে অনন্যা কোঅপারেটিভ ব্যাংক (১৮৮৯)। বাংলার ক্ষেত্রে আবার রাজ্য কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলি বাংলায় স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনে সহায়তা করেছিল। অন্যদিকে আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর শান্তিনিকেতন গঠনের মধ্য দিয়ে ও স্বনির্ভরতার অন্য এক চিত্র দেখতে পাই।

স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে বিশেষকরে শেষ তিন দশকে পশ্চিম মেদিনীপুরের আর্থসামাজিক পরিবর্তন এর প্রভাব পড়েছে মানুষের জীবনযাত্রার মানের ওপর। এই সময় প্রচুর কর্মসংস্থান ঘটেছে , জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত। যেটা আমরা পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি ও জনসংখ্যা পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। আমরা অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং বিতরণকে অর্থনৈতিক উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ লক্ষ্য করা হয়। গ্রামীণ উন্নয়ন এ স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম সরোজগার যোজনা এবং জাতীয় গ্রামীণ নিশ্চয়তা পদ্ধতির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করেছে, সাথে সাথে খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে।[6] অবশেষে জীবনযাত্রার মানের পরিকল্পনা মানিয়ে নিয়েছিল অথনীতির সূচক হিসাবে, এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে

---

[6] Paschim Medinipur District Human Development Report-2011

আমি পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনিভর গোষ্ঠীগুলির বিষয়ে আলোচনা করবো।২০০৯-১০ সালের মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরে মহিলা স্বনিভর প্রকল্পের সাহায্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির দ্বারা গ্রামসংসদের পরিকল্পনায় ৪০ টিরও বেশি 'নার্সারি' গড়ে উঠেছিল। স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সাহায্যে জঙ্গল থেকে কিছু বীজ সংগ্রহ করে বাইরে থেকে প্রযুক্তির উন্নত কৌশলকে শিখে এসে বেড় দিয়ে যত্ন সহকারে চারাগাছগুলিকে বড় করে বিক্রি করেছে এবং দেখা যাচ্ছে পরবর্তীক্ষেত্রে তারা আরও বেশিকরে পুঁজি বিনিয়োগ করছে এবং উন্নত প্রযুক্তিকে আয়ত্তকরে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।[7]

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ উন্নয়নকে আমরা দুটিভাগে ভাগ করতে পারি- ১)স্বনিভর প্রকল্প ২)বেতন নির্ভর প্রকল্প। যেটা ১৯৯৯ সালে চালু হয়েছিল গ্রামের মহিলাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যাদের আসল লক্ষ্য ছিল নিজেদের দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং তাদেরকে বিভিন্ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলোও ঋণ দিয়ে সাহায্য করত স্বনির্ভর হতে। যেটা আমরা স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর গবেষণায় দেখাচ্ছেন যে,কোনো মানুষ যদি তার দক্ষতাকে সঠিক পরিকল্পনামাফিক কাজে লাগাতে পারে, তাহলে একদিন দুর্ভিক্ষ মুক্ত পৃথিবী তৈরী করা সম্ভব হবে। তিনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সুফিয়া বেগমের মতো দরিদ্র মহিলাদেরেকে দক্ষতার বিচারে বিনা নিশ্চয়তায় ঋণ দিয়ে তাদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। যেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখাযাচ্ছে যে, উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রাচীন

---

[7] ibid

ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বাধাহয়ে দাঁড়াচ্ছে না।[৪] বরং বাধাহয়ে দাঁড়াচ্ছে মধ্যবর্তীশ্রেণী বা ভূস্বামীদের শোষণ করা অর্থ। যার ফলে গ্রামীন মানুষের দারিদ্রতা থেকেই যাচ্ছে। একইভাবে আমরা পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বনিভরগোষ্ঠীরাও কাজ করে চলেছে সাংস্কৃতিক বাধা বৈচিত্রকে এড়িয়ে, উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানকুন্ড উত্তর ৩ নম্বর ব্লক স্বনির্ভরগোষ্ঠী যারা ধূপের ব্যবসা শুরু করেছিল গ্রামের কয়েকটি পরিবারের মহিলারা মিলে। এক্ষেত্রে গ্রামের জাতপাত কখনোই বাধা হয়নি। সমস্ত জাতির মহিলারা এই ধূপকাঠি বানিয়ে কলকাতায় বিক্রি করতো, স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে।

অন্য আর একটি উদহরণ হল, গড়বেতা ৩ নং ব্লকের একটা স্বনির্ভরগোষ্ঠী ‘সাতবাঁকুড়া নরম খেলনা’। গ্রামের মহিলারা ছোটো ছোটো খেলনা তৈরী করে কলকাতায় সল্টলেকে ‘সকলি হল ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড’ কোম্পানিতে পাঠাত। অন্য আর একটি হল-‘মা শীতলা স্বনির্ভরগোষ্ঠী’ দাসপুর ১ নং ব্লক। এরা মাদুর তৈরী করত। পরবর্তীকালে কাঁচামালের দাম বাড়লেও সেই পরিমানে মাদুরের দাম না বাড়ায়, তারা মাদুর তৈরী বন্ধ করেদিয়েছিল। এর কারন হল-মাদুর শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের অশঠতা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্বাধীনোত্তর পশ্চিম মেদিনীপুরের উন্নতিতে স্বনিভর গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা, সরকারি উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখাযায় যে, স্বাধীনতার পূর্বে গ্রামীণ অথনীতি ব্রিটিশ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় গ্রাম সমাজ পুরোপুরি

---

[৪] ইউনুস, মুহাম্মদ,(২০০৬) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও আমার জীবন, অনুবাদ ইলা লাহিড়ী ও জয়ন্ত লাহিড়ী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পৃ ৮২

স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি। সঠিক পরিকল্পনা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ যদি হয় তাহলে উন্নয়ন হবেই। যেটা স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ ও আমার জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বাড়বাড়ন্ত যা সাম্প্রতিককালে দেখা যায়। যেমন-তাদের টাকা আদায় করার পদ্ধতি, সাধারন মানুষের উপর মানসিক চাপ, যার জন্য মুহাম্মদ ইউনূসকে গ্রেপতার হতে হয়েছিল। আমাদের রাজ্য তথা আমার জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরে এমন স্বনির্ভরগোষ্ঠীর বাড়বড়ন্তের দৃষ্টান্ত আছে। সেখানে দেখাযাচ্ছে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সাপ্তাহিক কিস্তি জোগাড় করতে না পারার জন্য সাধারন মানুষ আত্মহত্যা করছে। তবে ভালো-মন্দ সব মিশিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গ্রামণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে

প্রথম অধ্যায়

মনীষীদের ভাবনায় সমবায় চিন্তা ও সমবায় আন্দোলন

‘সমবায়’ শব্দটি মানুষের মধ্যে অন্তরের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এর ফলে মানুষ নিজে থেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। এই সমবায় বা ‘cooparetive’ শব্দটির একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে। আবার এই দার্শনিকতার সামাজিক, ধর্মীয়, ও আর্থিক ধারণাও রয়েছে।

সামাজিক ধারণা:-

পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবদ্ধ জীব হচ্ছে মানুষ। সে তার নিজস্ব বুদ্ধির বলে সহযোগিতাকে হাতিয়ার করে সমাজের উন্নয়ন বা বিকাশ ঘটায়। অধ্যাপক ডঃ সি. সি. টেলর বলেন যে, মানুষের আচরণের তিনটি দিক আছে- সহযোগিতা, সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা। আবার তিনি বলেন যে, ব্যক্তিকে উচ্চকাজের জন্য উদ্দীপিত করা ও উৎসাহ জোগানো, সংঘর্ষে সংঘর্ষকারীদের উদ্দেশ্য বা কাজ পরস্পরবিরোধী। প্রতিযোগিতায় তারা পরস্পরবিরোধী বা সমান্তরাল, সমবায়ে তারা সমান্তরাল বা পরস্পরসহযোগী। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিযোগিতা হচ্ছে ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগের প্রধান উদ্দীপক[9]। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বা অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে কাজ করার চেয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় কাজ করে অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে। অতএব ইংরজী শব্দ 'cooparetion' - এর বাংলা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সহযোগিতা যা যৌথ ভাবে কাজ করার এক প্রয়াস।

---

[9] Taylor, C C Objectives of Farmer Co-operatives by a Sociological American Co-operation, 1949, pp. 63-73

ধর্মীয় ধারণা:-

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা মনে করতেন যে, সমবায় শুধুমাত্র জীবন পদ্ধতি নয়,এটা ঈশ্বরের দান। এর মূল কথা হল সমবায় অখ্রিষ্টীয়ও হতে পারে। কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সমবায় লাভ না করলে, প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। কারণ প্রতিষ্ঠানটি পুঁজির জোগানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারবে না।

আর্থিক ভাবনাঃ-

যে কোন ব্যবসাকে ভালোভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার পদ্ধতি-ই হল সমবায়ের আর্থিক দর্শন। আমরা যদি সমবায়ের ইতিহাস দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, বিভিন্ন আর্থিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও জীবন পদ্ধতি হিসাবেই সমবায়ের উত্থান ঘটে। ইউরোপের প্রভিডেন্ট সোসাইটিজ থেকে শুরু করে ফ্রেন্ডলি সোসাইটি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শ্রমিক ইউনিয়নগুলি সংঘবদ্ধ হতে লাগল মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মজুরকে রক্ষা করা ও সমবায় তৈরির জন্য। পরবর্তী সময়ে এইগুলি বিবর্তন ও সমবায়ের মধ্য দিয়ে রচডেল সৃষ্টি করেছিল।[10] এই অর্থনৈতিক দর্শনগুলোকে আলোচনার আগে আমাদের সমসাময়িক ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে চাষ ছিল কৃষকের জীবনধারনের একমাত্র উপায়। ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে যখন শিল্প বিপ্লবের জোয়ার আসল তখন দলে দলে কৃষক কৃষিজমি ছেড়ে কলকারখানার শ্রমিক হিসাবে কাজে যোগ দিতে লাগল। অন্যদিকে, আবার কারখানায় কাঁচামালের জোগান বৃদ্ধির জন্য বড় বড় কৃষি খামারের প্রয়োজন হল। কিন্তু বড় বড় খামারে কৃষকের সংকট দেখা দিল। এক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের

---

[10] Mamoria, Dr. C B and Shaksena, Dr. R D, Cooperation in India, p. 120

আর্থিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে সামন্তপ্রভু ও কৃষকের সম্পর্কের জায়গায় কারখানার মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। এভাবে মালিকের শোষণ ও অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। আর এই উনিয়ন-ই হচ্ছে সমবায়। এরাই প্রকৃতভাবে আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর গড়ে ওঠা সমবায় দর্শন।

সংস্কারবাদীঃ-

সংস্কারবাদী পণ্ডিতগন সমবায়ের মধ্যে থাকা সমাজের সংঘাত, যেগুলি মূলত শ্রমিক ও পরিচালক, উৎপাদনকারী ও ভোক্তা ইত্যাদিদের বোঝান। একেই সমবায় পরিচালনা ও সম্পদ বিতরণের উপায় বলে মনে করেন।

বিপ্লববাদীঃ-

এই বিপ্লববাদীরা সবসময় মনে করেন যে, সহযোগিতাই সমাজের চাবিকাঠি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব আর সমাজ থেকে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণিগত দ্বন্দ্বগুলি প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- কৃষকের সাথে জমিদারের, কৃষকের সাথে সরকারের, কারখানার মালিকের সাথে সরকারের, মহাজনের সাথে কৃষকের, একটি সমবায়ের সদস্যের সাথে অন্য সমবায়ের সদস্যের, এগুলি সমবায় গুলিতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। এগুলির প্রতিফলন ঘটে সাধারন সভায়, মামলা মোকদ্দমায়। এদের অস্তিত্বের কথা অনেকেই মনে করেন না। কিন্তু এখানে বিপ্লববাদীদের বক্তব্য হচ্ছে এই সমবায়িক দ্বন্দ্বগুলির এদের ভেতরকার ও সমবায়ীকাজগুলিকে সামনে আনে। সমবায়ের লক্ষ্য এক, সমবায়ের সদস্যগন এক সমবায়ের ভিত্তিতে চলে, সমবায়ের সদস্যরাই মালিক ও সদস্যগণই ব্যবহারকারী সেই জন্য এই দ্বন্দ্বগুলি বৈরিতামূলক বোর্ডের

সদস্যরা সকলে মিলে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সমাধান করে নতুন নতুন চিন্তার ও সিদ্ধান্তের উদয় হয়।

বিবর্তনবাদীঃ-

এই মতবাদে বিশ্বাসী পন্ডিতগন কখনোই স্বীকার করেন না যে সমবায়ের উৎপত্তি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে হয়েছে। এঁরা সবসময় মনে করেন যে সমবায়ের উৎপত্তি হয় বিবর্তনের হাত ধরে, যেমন-ক্যাপিটালিসম বা ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমবায়ের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটেছে।[11] যদিও আমরা এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে অন্য কারণ খুঁজে পাই।

প্রাচীন ভারতে সমবায় দর্শনঃ-

'সমবায়' শব্দটি নতুন হলেও ভারতবাসীর কাছে কখনোই নতুন নয়। কারণ তারা নিজেদের অজান্তেই প্রাচীনকাল থেকেই সহযোগী ও সমবায়ীভাবে জীবন কাটিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে সমবায়ের কয়েকটি রূপ দেখা যায়-

কুলঃ-

প্রাচীন ভারতে সমবায় কাণ্ডের প্রথম রূপ হল কুল। এটা ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন। যেখানে জাতি বন্ধুবান্ধবরা সকলেই সমানভাবে কাজ করত তাদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থের অগ্রগতি জন্য। সামাজিক স্থিতি ও সামাজিক অগ্রগতির ফলে এগুলি যৌথ পরিবারে পরিণত হল, যা আজ পর্যন্ত চলেছে। এই প্রণালীতে জমি ছিল যৌথ মালিকানায় ও চাষ হত যৌথভাবে। পরিবারের সদস্যদের কৃষি ছাড়াও অন্যান্য কাজ যৌথভাবে

---

[11] অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফডোরশেন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমটিডে , ২০১৬, কলকাতা, পৃ-৬৪,

করতে হত। পরিবারের সদস্যগন একটি সাধারণ বাড়িতে বাস করতেন, পরিবারের খরচও যৌথ সম্পত্তির আয় থেকে বহন করা হত। পুরো সংগঠনটি চলত পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। এই কুল প্রথা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করলেও আজও তার অস্তিত্ব বর্তমান।

গ্রামঃ-

যখন থেকে কুল একটি প্রতিষ্ঠিত একক হিসাবে পরিণতি পাচ্ছে তবে থেকে গ্রামের প্রকাশ ঘটছে। এই গ্রামগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক, কর্মপদ্ধতি গ্রহনের জন্য বিশেষ ভূমিকা নিত চারণভূমি, রাস্তা, দূরগামী সড়কপথ। সাধারণ বাগান ও জমি দেখাশোনা করত হস্তশিল্পী ও কৃষকগন যৌথ ভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমবায়ের কাজ করত। গ্রাম সভার সদস্যগন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অনান্য দ্রব্যাদিও ক্রয় বিক্রয় করত।

শ্রেণীঃ-

পরবর্তী বৈদিকযুগে ক্ষুদ্র পরিবার, শিল্প শ্রমিক, হস্তশিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী, কৃষক, গৃহনির্মাণকারী ঠিকাদারদের অধীনে নির্মাণকর্মে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সংগঠন, শুধুমাত্র ব্যাংকার হিসেবে নয়, দাতব্য হিসাবেও শ্রেণির ভূমিকা যথেষ্ট।[12] পরবর্তীকালে শ্রেণীব্যবস্থার সঙ্গে আজকের সমবায় ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা করবো।

জাতিঃ-

জাতিস্তরের সমবায় ছিল সমাজের জন্য। যেমন- শিক্ষা, দাতব্য, এবং ত্রাণের কাজের জন্য। কিন্তু যখন কোন বিশেষ শিক্ষা , হস্তশিল্প ও ব্যবসা কোন একটি বিশেষ বর্ণের সাথে যুক্ত

---

[12] ibid

হয়ে যেত তখন একটি বিশেষ প্রনালী নির্ধারিত হত যেখানে সমবায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করত।[13]

গনঃ-

সবচেয়ে প্রাচীণ উপনিষদ বৃহদারন্যক উপনিষদে জানা যায় যে,ব্রহ্মা সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের মতো কেবল চারটি শ্রেণি তৈরি করে সন্তুষ্ট হন নি। পরে তিনি বৈশ্য নামক এক শ্রেণি ও সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে, বৈশ্যরা ধন সম্পদ আহরন করবে যেটা কিনা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বারা সম্ভব নয়। এই বৈশ্যরাই নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি যৌথ সমবায় সংগঠন গড়ে তুলবে। অতএব প্রাচীনকালে মানব সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণ বা সমবায়ের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই গণকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে এটা একপ্রকার গিল্ড হিসাবে ধরা হয়।

পনিঃ-

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ‘কর্পোরেট লাইফ ইন অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া’ বইতে বলেছেন যে, প্রাচীণ ভারতে ব্যবসায়ীদের কাছে নিরাপত্তার কারণে কিছু সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠে। আসলে তখন ব্যবসায়ীরা দূর দেশে ব্যবসার জন্য ক্যারাভ্যানে করে যেতো, পথে ডাকাত ও বিভিন্ন ধরনের উপজাতিদের হাতে তাঁরা আক্রান্ত হতেন। একা তাদের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না, তাই দস্যুদের মোকাবিলার জন্য প্রাচীনকালে ব্যবসায়ীরা সংগঠন বা সমবায় গড়ে তুলেছিল।[14]

---

[13] Mamoria, Dr. C B and Shaksena, Dr. R D, Cooperation in India, pp.180-81

[14] Majumdar,Ramesh Chandra. Corporate Life in Ancient India. pp,27

শ্রেষ্ঠীঃ-

আমরা জানি যে, বৈদিকযুগে 'শ্রেষ্ঠী' শব্দটি সংগঠন বা সমবায়ের উচ্চতর পদ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। তবে পরবর্তী সময়ে এই 'শ্রেষ্ঠী' শব্দটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আর কে মুখার্জি তাঁর ‘লোকাল গভর্নমেন্ট ইন অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া’ বইতে এই শ্রেষ্ঠী শব্দটি সমবায়/গিল্ডের সর্বোচ্চআধিকারী হিসাবে ব্যবহার করেছেন।[15] কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এই শব্দটি অথর্ব বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মনে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর উচ্চতরপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি।

পুগ ও ব্রতঃ-

প্রাচীন ভারতের এই দুটি সংগঠন-ই নিজস্য সদস্য ছিল, এরা গ্রাম ও শহরের নির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত ছিল। পানিনি বলেন যে, প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন বর্ণের সমবায় হচ্ছে পুগ। এদের নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই। এরা একসাথে জীবন কাটাতো সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে যাগ্মবল্ক্যসংহিতায়ও এদের কথা উল্লেখ আছে। এখানে আবার শ্রেণি ও পুগ-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। 'পুগ' শব্দ যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষকে বোঝায়। শ্রেণি কিন্তু একক পেশার উপযোগী কারুশিল্পীদের সমবায়কে বোঝায়। যাই হোক, মনু, কৌটিল্য, পানিনির ভাষ্যকারগণ এবং মহাভারতকার গণ, একমত হয়েছেন যে, শ্রেণি শব্দটি কারুশিল্পী,কৃষিজীবী বা বণিকদের সম্মিলিত সঙ্গকে বোঝায়।

---

[15] Mukherjee, Radha Kumud. Local Govt.in Ancient India.pp.45

নিগমঃ-

বিশেষত প্রাচীনযুগে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংগঠন হল নিগম। পনি, নিগম ও শ্রেণি ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায় হিসেবে কাজ করেছে। এই সমবায় সংগঠনগুলি প্রাচীন ভারতে মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আবার প্রাচীন ভারতে সিলমোহরগুলিতেও 'শাহিজিতিএ নিগমশ' লেখাটি হচ্ছে ব্যবসায়িক সমবায়ের চিহ্ন হিসাবে মনে করেছেন।[16] আবার ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই 'নিগম' শব্দের অর্থ বলেছেন সমবায়। অন্য দিকে আর. সি. মজুমদার এই 'নিগম' শব্দের অর্থ হিসেবে বলেছেন নগর। এই সংগঠনগুলি রাজার সাথে আলোচনা করে তৈরি হলেও এগুলির ওপর সংগঠনের প্রতিনিধিদের পূর্ণ আধিকার থাকতো।

এই ধরনের সংগঠন/ সমবায়/ গিল্ডের অবস্থান এটাই প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতে মানুষদের মধ্যে কর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে সমবায় প্রথার ও অস্তিত্ব ছিল এবং এই প্রথাই পরবর্তী কালে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সম্মুদ-ভানিজ-জাতক থেকে আমরা জানতে পারি যে, বারাণসীর কাছে একটি বৃহৎ শহরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যেখানে ১০০০ সূত্রধর পরিবার বাস করত। একটা সময় তারা শহর ছেড়ে দ্বীপে বাস করেছিল। এই কাহিনি থেকে সমবায়/গিল্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়। যা কিনা বর্তমানে সমবায় ব্যবস্থার এক অন্যতম প্রতিরূপ বলা যায়।

---

[16] বন্দ্যোপাধ্যায় অশোক, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা, পৃ-11

সমবায় নিয়ে বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাঃ-

সমবায় বা ‘co-oparetive’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ কো-অপারেয়র (cooperare) থেকে। আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে সমাজের একই স্তরে থাকা মানুষগুলির সম্মিলিত শক্তিই হচ্ছে সমবায়। এই ‘সমবায়’ শব্দটির আবার দার্শনিক ভিত্তি আছে।

যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে-

“আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া

বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া”।[17]

আবারও আমরা কামিনী রায়-এর ‘সুখ’ কবিতায় দেখি যে,-

“আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে

আসে নাই কেহ অবনি পরে

সকলের তরে সকলে আমরা ,

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে”।[18]

---

[17] অসীম রায়, ২০০১ ,জুলাই, পৃ-

[18] তদবে

এখানে প্রত্যেকে সকলের জন্য আর সকলে পরের জন্য (each for all and all for each)। অপরকে সাহায্য করার মাধ্যমে নিজেকে সাহায্য করার ভাবনা ও আচরণের অভ্যাস-ই হল সমবায় দর্শন।

কার্ল মার্ক্সঃ-

আমরা আন্তর্জাতিক সমবায় সমিতির বিভিন্ন প্রবন্ধে কার্ল মার্ক্সের সমবায় ভাবনার যথেষ্ট প্রকাশ পাই। তিনি বলেন যে, যে সমস্ত মানুষরা কোন রকম সহায়তা ছাড়া সমবায় আন্দোলনকে সাহসিকতার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করেছে তাদের সামাজিক পরীক্ষার মূল্য অসীম। সমবায় দেখায় যে শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়োগ করার জন্য মালিক শ্রেণি না থাকলে বৃহৎ আকারে আধুনিক বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া যায়। ১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সমবায়ের প্রস্তাবটি কার্ল মার্ক্স তুলেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ থাকায় সমবায় আন্দোলন নিজে শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে পারে না। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব ভিত্তি তুলে ধরতে পারে।[19] এক্ষেত্রে তিনি আরও বলেন যে শ্রমিকরা সমবায় সংগঠনের চেয়ে সমবায় উৎপাদন সংস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেবে। এতে আবার লক্ষ্য রাখতে হবে যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির যৌথ কোম্পানিতে পরিনত না হয়ে সমবায় গুলিতে অংশগ্রহণ করে। সমবায় সমিতির সদস্যরা তাদের যৌথ আয়ের একটা জমানো অর্থ দিয়ে নতুন সমবায় সংস্থা গড়ে তুলবে এবং সাথে সাথে শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থাও করবে। আসলে মার্ক্স ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপরীতে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণির সমবায়ী অর্থনীতির কথা বলেছেন যার মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের

---

[19] মার্কস, ১৮৬৪, পৃ.১১, ও মার্কস- এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্ক,পৃ, ১৪-১৫।

ভবিষ্যৎ অনেকখানি সুরক্ষিত হবে। ভবিষ্যতে তাদেরকে আর কোনো শোষণ ও নিপীড়ন ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হবে না।

লেনিনঃ-

মার্ক্সবাদী তত্ত্বের এক অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভি আই লেনিন। ১৯০৫ সালে তাঁর ‘The latest in Iskra Tactic’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে ধনতন্ত্র ব্যবস্থার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে যে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা কিন্তু এই সমবায় পদ্ধতির মাধমেই সম্ভব। সমাজতন্ত্র হল একটি ভোক্তা সমিতি যার উৎপাদন ও ভোগ পরিকল্পনা মাফিক ঘটে। তিনি বিশ্বাস করেন যে যেদিন এই সমবায় সমিতিগুলির রাশ সাধারন মানুষের হাতে থাকবে সেদিন সমবায়ের পুরোপুরি জয় সাধিত হবে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, বিশেষত সাধারণ মানুষই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে। আর এটার চালিকা শক্তি হবে সমবায়। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে যেভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তা সত্যিই সফল হবে সমবায়ের রাশটা যদি শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির হাতে থাকে। তবে গিয়ে পৃথিবীতে একদিন ধনতন্ত্রমুক্ত অর্থনীতি গড়ে উঠবে এবং শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে।

স্বামী বিবেকানন্দঃ-

স্বামী বিবেকানন্দের সমবায় ভাবনাটি ছিল নির্মল, স্বচ্ছ, শুভ্র গঙ্গোত্রী ধারার মতন আজন্ম বহমান। তাঁর যে কথায় আমরা সমবায় চেতনার প্রকাশ পাই,তা হল –“যে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় না, তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ ও ইচ্ছা নাই, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ব্যক্তিপুঞ্জে একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে”।[20] সমষ্টিগতভাবে সমাজবদ্ধ জীবন গড়ে উঠেছে সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে। তাই বিবেকানন্দ দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জাতিভেদপ্রথা, কুসংস্কারকে মোছার জন্য সমবায়ের কথা বলেছেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন যে, মানুষ ও দেশকে ভালোবাসার মধ্যে চাই co-operation আর সমবায় মিলনের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে তা সিংহশক্তির মতন অসীম, অপরাজেয়**।** সমবায় নিয়ে তিনি আরও বলেন যে, আমরা যখন সমবায়ের মাধ্যমে দেশের ও দশের উন্নতির কথা ভাবি সে সময় আত্মসমর্পণের কথা ভুলে বৃহত্তর মানুষের স্বার্থকে সামনে রাখতে হবে। আদর্শ কাজ সর্বদাই স্বার্থ ও আত্মপরতা থেকে দূরে থাকবে। আমরা আরও দেখি যে, একজন ইংরেজ হয়েও হ্যামিলটন সাহেব ও তাঁর স্ত্রী সুন্দরবন অঞ্চলে গিয়ে গরীব মানুষদেরকে সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঁচার তাগিদ দেখিয়েছিলেন সমবায়ের মধ্য দিয়ে, যেটা তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তিনি আরও বলেন যে, তুমি যদি পৃথিবীকে উন্নত করতে চাও তাহলে নিজেকে ভুলতে হবে, গ্রহণ করতে হবে সার্বজনীনতাকে।[21] স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতায় শূদ্র জাগরণও আজ সমাজের দিকে দিকে আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছে। নিম্নবর্গীয় মানুষ, সাব- অল্টার্ন গোষ্ঠীরা বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে অরণ্যের অধিকার চায়। তারা চায় চা-বাগিচায় দুটি পাতা, একটি কুঁড়ি আহরণের মাধ্যমে বাঁচার দাবী। এভাবেই স্বামীজি জোটবদ্ধ সমবায় ভাবনার মধ্য দিয়ে অসহায়, উৎপীড়িত জনগনের মূলস্রোতে ফেরার প্রক্রিয়াকরণের কথা বলেছিলেন ।সবাইকে নিয়ে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা-সমবায় সে কথাই বলে। বিবেকানন্দের বাস্তব চিন্তার প্রসারণ-ই বুঝি আজকের সমাজের স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের মেয়েদের গৃহাঙ্গন ছেড়ে বাইরের জগতের কল্যানকর্মে নিযুক্ত হওয়া।

---

[20] ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাণ্ডার, সমবায়ের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ,২০১৯, জানুয়ারি, পৃ-২৫

[21] তদেব.

অতএব বলা যায় যে, সমবায় সম্পর্কে স্বামীজির ধারণা ছিল মূলত পাশ্চাত্যভিত্তিক। কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শ ও সমাজ রূপায়ণের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে,সামাজিক দারিদ্র ও সর্ববিধ বৈষম্য দূরীকরণের যে ভাবনা তিনি পোষণ করতেন এবং প্রচার ও প্রসার করেছিলেন, সমবায় আন্দোলনকে সফল করতে হলে তার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং তার মূল্যায়ন অপরিহার্য।

ভগিনী নিবেদিতাঃ-

স্বামী বিবেকানন্দের এক শিষ্যা হিসাবে ভারতে এসে এদেশের দরিদ্র মানুষের সেবায় তিনি নিজেকে যেভাবে নিয়োজিত করেছিলেন তাতে আমরা তাঁর এক সমবায়ী মননের এক বিশিষ্ট দিক খুঁজে পাই। ১৮৬৭ সালের ২৮ সে অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগানন শহরে তিনি জন্ম গ্রহন করেন। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি রাগবি নামে এক অনাথ আশ্রমে যোগ দেন। তাঁর পর খবরের কাগজে গরীব দুঃখীদের নিয়ে বিভিন্ন লেখালেখি করেন। তিনি নিজে ডাক্তার খানা, লঙ্গরখানা ও গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলেন। শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণে মুগ্ধ হয়ে তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের মাধ্যমে গরীব, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় এসে বিবেকানন্দের কাছে ভগিনী নিবেদিতা নাম নিয়ে লেগে পড়েন কলকাতার মহামারী প্লেগ থেকে সাধারন মানুষকে তাঁর মাতৃসুলভ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সারিয়ে তোলার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এদেশের মানুষের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র, অসহায়তা এই সব দূর করতে না পারলে মানুষের মধ্যে আর জাগরণ আসবে না। তিনি প্রথম এখানে মেয়েদের শিক্ষার কথা ভেবে স্কুল তৈরি করেন। ভগিনী নিবেদিতার এই জনসেবামূলক কাজকর্ম দেখে রবীন্দ্রনাথ তাকে 'লোকমাতা'

আখ্যায় ভূষিত করেন। তিনি ভারতের বৈচিত্র্য-এর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ হবার কথা বলেন। তিনি বলতেন যে, ‘আমার কাজ জাতিকে জাগ্রত করা'। তিনি মিলেমিশে কাজের ঐক্যকে ভিত্তি করে ভারতের জাতীয়তাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে ত্যাগ করার ব্যাপারে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন ‘দেশের লোকের দ্বারা মিলিত প্রচেষ্টায় যে কাজ তাই জাতির পক্ষে সত্য[22]’। এদেশ থেকে ব্রিটিশদেরকে তাড়াতে হলে সবাইকে একত্রিত করতে হবে এবং সঙ্গে নিতে হবে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র হিসাবে বন্দেমাতরমকে, যা পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিশারি হিসাবে কাজ করে। তাঁর দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য কাজে মুগ্ধ হয়ে শ্রী অরবিন্দ তাকে 'অগ্নিকন্যা' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯০৩ সালে মেদিনীপুরে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে স্থানীয় যুবকদের আখড়ায় অভ্যস্থ করার কথা বলেন। আবার নিজে তলোয়ার খেলে, মুগুর ভেঁজে, লাঠি ঘুরিয়ে ও অন্যান্য শত্রু মোকাবিলার কসরত দেখিয়ে উৎসাহিত করতেন। তিনি দু’জন মহিলাকে বন্দুক ছোঁড়ার কাজ শিখিয়েছিলেন যারা নাকি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আবার বসু বিজ্ঞান মন্দির গড়ে তোলার পেছনে নিবেদিতার যথেষ্ট আর্থিক সহায়তাও ছিল। এভাবে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা ও তাদের সবার সঙ্গে মিশে তিনি যে সমবায়ী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজও ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

মহাত্মা গান্ধীঃ-

‘সমবায়’ কথাটি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর কথাতেও আমরা পাই। তিনি সবসময় ভারতের দরিদ্র মানুষদের স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন। মানুষ যাতে নিজের হাতে চরকা কেটে

---

[22] প্রবীর কুমার সামন্ত, ভাণ্ডার,সমবায়ী মননে ভগিনী নিবেদিতা, ২০১৭,অক্টোবর,পৃ- ১৯

উপার্জন করে কুটিরশিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে অর্থনীতি মজবুত করে, সে ব্যাপারে যথাযথ পরামর্শও তিনি দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে,ভারতবর্ষের মতো বড় একটি দেশ যা দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজ শাসন ও শোষণ-এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত সেখানে সমবায়- এর কার্যকর প্রয়াস ছাড়া জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়।[23] ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমবায় যে কাজ করে দেখিয়েছে তার মূলে আছে-ব্যক্তিগত ও সামাজিক দূরত্বকে দূরে সরিয়ে রেখে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার দুর্মম বাসনা ও ঐকান্তিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন। আমাদের দেশেও এই ঐক্য ভাবনা সম্ভব হয়েছে ড্যানিয়েল হ্যামিলটন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখের প্রাণবন্ত চেষ্টায় এবং যা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে সমবায়ের জয়যাত্রা সম্ভবপর করে তুলে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ সাধন করেছে। আমরা দেখি যে গান্ধীজী ছোট বেলা থেকেই কৃচ্ছসাধনার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি সত্যাগ্রহ অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং জনসাধারনের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে তা নিয়েও মতামত দেন। এগুলি কিন্তু গান্ধিজির সমবায় ভাবনারই প্রতিফলন আর এই কারণের জন্যই তিনি এতবড় ভারতবর্ষের মানুষের কাছে মহান হতে পেরেছিলেন। গান্ধিজির সমবায় ভাবনার প্রথম প্রকাশ পায় দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন যখন 'টলস্টয় ফার্ম' গড়ে তুলেছিলেন। ১৯০৭ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজদের দমন পীড়নে তটস্থ হয়ে ভারতীয়দের নিয়ে জোহনাসবার্গ ক্যালেনব্যাক নামক জনৈক জার্মান বন্ধুর প্রদত্ত ১১০০ একর জমিতে গান্ধীজী টলস্টয় ফার্ম গড়ে তোলেন। তাঁর মতে এটাই ভারতে সমবায় আন্দোলনের পথ দেখাবে। তাই দেশে ফিরে আমেদাবাদের করোব গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তী সময়ে সবরমতিতে স্থানান্তরতিত করা হয়। সেখান থেকে

---

[23] রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাণ্ডার, প্রজাতন্ত্র দিবস ও সমবায় ভাবনা,২০১৯, জানুয়ারি, পৃ-৪৭

গান্ধীজী স্বদেশী ভাবনা ও স্বনির্ভরতার পাঠ দিতেন। যার ফলে পুঁজিবাদী আগ্রাসন থেকে গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকখানি রক্ষা পেয়েছে। ১৯১৮ সালের ৫ মে গান্ধীজী দিল্লিতে স্বদেশী কোওপারেটিভ স্টোরের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন গ্রাম ভারতের মধ্যে-ই লুকিয়ে আছে আসল ভারত।[24] আর সমবায়ের মূল লক্ষ্য হবে সেই গ্রামকে সফল করা। বঙ্গভঙ্গের সময় 'স্বদেশী ভাণ্ডার' ও 'তিলক স্মরণ ভাণ্ডার' কিন্তু সমবেত হয়ে অর্থ সংগ্রহের এক নজির। দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য যে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন করেন - এটিও কিন্তু সমবায় আন্দোলনকেন্দ্রিক| শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের যাতে শিক্ষা অর্জনের পর জীবিকার জন্য অসুবিধা না হয় সে জন্য হাতের কাজ শিখে নিজ নিজ গুণে শিল্পসামগ্রী তৈরি করে সেগুলি বাণিজ্যিকরণের মাধ্যমে নিজের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। আজকের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলো গ্রামীণ মহিলাদের মাধ্যমে বিকশিত হচ্ছে। এই বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে গ্রাম সমবায়, যারা অর্থ সঙ্কটকে কাটাতে ঋণ দেয়।

গান্ধীজীর গ্রাম পুনর্গঠনের ভাবনাঃ-

গান্ধীজী গঠনমূলক স্বদেশীর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির যে পুনর্গঠনের কথা বলেছিলেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাথে সমবায় নীতির এক গভীর সম্পর্ক আছে। বিদেশি দ্রব্যের পরিবর্তে তিনি দেশজ পণ্যের উৎপাদনে জোর দিয়েছিলেন। তিনি নিজে চরকা কেটে 'খাদি' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায্য মুল্যের দ্রব্য সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে সমবায়ের আদর্শের কথা বলেছিলেন। তিনি স্বরাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেও সমবায়-এর ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে সাদা চামড়ার শাসনের দিন শেষ, এবার কালো চামড়ার দিন আসছে। আর মানুষকে জমিদার ও বিদেশি শাসকদের হাতে ঋণ নিতে হবে না। তিনি তাঁর বক্তব্যের

---

[24] ibid

মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমবায় ভাবনার প্রত্যয় ঘটিয়েছিলেন।[25] সমবায় বলতে আমরা বুঝি সমষ্টি বা সমূহ। এর ভিত্তি হল পরস্পরের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ ও সহযোগিতা। আমরা দেখেছি যে প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করছে। বাইরের শত্রুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য। আবার প্রতিটি মানুষকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই মজবুত একটি সংগঠন, সমবায় হল সেই সংগঠন যেখানে মানুষের মুনাফার বৃদ্ধি ঘটে না। সমবায় সর্বতোভাবে সমবণ্টনের আদর্শে উৎসর্গীকৃত এক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা যা গরীব মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাটিকে বিশেষ মাত্রায় উন্নতি করতে পারে। গান্ধীজীর সমবায় চিন্তার মাধ্যমে দেশের সাধারন মানুষকে এমন শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, যাতে করে তারা নিজের হাতে কলমে কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।তিনি আরও বলেছিলেন যে সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষ, বয়স্ক মানুষ যারা সংসার নির্বাহ করতে গিয়ে লেখা পড়ার সুযোগ পান নি তাদেরকে বিশেষত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তিনি চেয়েছিলেন যে গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট অসংখ্য শিল্প গড়ে উঠবে এবং সেখান থেকে উৎপাদিত দ্রব্য সমবায়ের মাধ্যমে বাজারিকরণ হবে। এইভাবে একদিন গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে, সমাজ গনতান্ত্রিক ভাবে সমবায়ের মাধ্যমে নিজস্ব উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে। এভাবেই গান্ধীজী সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোর কথা বলেছিলেন।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুঃ-

আবার নেতাজীর অর্থনৈতিক ভাবনাতেও আমরা সমবায়ের উল্লেখ পাই। তিনি বিশেষ করে নারীমুক্তির সদর্থক পদক্ষেপ হিসাবে নারীদের সমবায়ী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কথা

---

[25] অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা, পৃ- ৭৯

ভেবেছিলেন। এই প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে তিনি বিপ্লবী লীলা রায়কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। লীলা রায় তাঁর ‘দীপালি’ সঙ্ঘের ছত্রছায়ায় নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার উপায় হিসাবে সমবায় ব্যবস্থায় ‘সীবন শিক্ষালয়’ গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে মেয়েদের হাতে - কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সূচিশিল্পকে কেন্দ্র করেই আদৃত হয়েছিল এই মহতী ভাবনা। ঔপনিবেশিক ভারতে নারীদের জাগ্রত করার ব্যাপারে সমবায় ভাবনাই হল বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনে গড়ে ওঠা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমূহ (self-help group)- সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে গড়ে ওঠা ‘দীপালি’ সঙ্ঘ-ই তার প্রেরনার মূল উৎস।

নেতাজীর দেশের তথা মানুষের উন্নয়ন-এর ভাবনার বহুমুখিনতা থাকলেও উদ্দেশ্যগত দিক কিন্তু একই ছিল। উন্নয়নের ভাবনার সাথে স্বাধীনতা যে পরস্পর সম্পর্কিত- এ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন তাঁর ভাবনা যুক্ত বলেছেন যে, ‘ উন্নয়ন ভাবনা একটি বহুমাত্রিক পার্থিব বিষয় যা শুধু অর্থনৈতিক বিষয় দিয়ে বোঝানো যাবে না,[26] এর সাথে আর্থিক স্বাধীনতার বিষয়টিও খুবই প্রাসঙ্গিক। এই স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ তার মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ভাবনা তাকে তাড়িত করে না। আবার উন্নয়নের সাথে সাংস্কৃতিক উন্নয়নকেও উপেক্ষা করা সম্ভব না, যাকে এককথায় ‘পোস্ট অ্যাপ্রোচমেন্ট’ বলা হয়। যার মূল কথা হল যে একজন মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবনায় গড়ে তুললেও তার মধ্যে যদি সাংস্কৃতিক মানবিক মূল্যবোধের ধারণা তৈরি করা না যায় তবে রাষ্ট্রের উন্নয়ন নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে পারে।

---

[26] প্রদীপ কুমার পাঁজা, ভাণ্ডার, সমবায় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সুভাষ চন্দ্র বসু,২০১৯, জানুয়ারি,পৃ-৪৩

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ঃ-

সমবায় ভাবনার কথা আমরা আরেকজন মহাপুরুষের কাছে জানতে পারি তা হল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ১৯২৪ সালের ৫ই জুলাই বেঙ্গল কো অপারেটিভ অরগানাইজেশন সোসাইটির এর উদ্যোগে আয়োজিত সমবায় দিবস পালনের ভাষণে তিনি বলেন-‘জাতি গঠন কার্যে ভারতীয়রা সাহায্যের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল থাকতে অভ্যস্থ। এটি একটি জাতীয় দুর্বলতা। সমবায় হচ্ছে একমাত্র উপায় যা এই দুর্বলতা দূর করতে পারে ও জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করে’।[27] তিনি আরও ব্যাখা করে বলেন যে, ব্রিটিশ রাজত্বে কৃষক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুমাতে যায়.তাই সমবায়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার কথা বলেন কৃষককুলকে। তিনি সমবায় আন্দোলনে সরকারী সাহায্যকে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন বলে রবীন্দ্রনাথ ও নেহরুর সঙ্গে একমত হয়েছেন। ১৯১৭ সালে তিনি ‘আইরিশ এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশান সোসাইটি'র আদলে ' দ্য বেঙ্গল কো অপারেটিভ অরগানাইজেশন সোসাইটির’ প্রতিষ্ঠা করেন। এর সাথে যুক্ত ছিলেন মহারাজা মনিন্দ্র চন্দ্র নন্দী, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি , স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন প্রমুখ।

আসলে আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবো যে, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বড় হয়েছিলেন একটা সমবায় ভাবনার পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। পিতা হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী খুলনা জেলায় রাড়ুলি গ্রামে ‘লোণ অফিস’ চালু করার মধ্যে দিয়ে সমবায় ভাবনার বিকাশ ঘটান। গ্রামের যেসব মানুষের বেশি অর্থ ছিল তারা নিরাপত্তার কারনে লোণ অফিসে সেই অর্থ জমা রাখতেন নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে। এইভাবে অর্থের বৃদ্ধির ফলে ঋণ দানও বাড়তে থাকে। এলাকায় সমবায় স্থাপনের পরিবেশও তৈরি হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যখন বিদেশ থেকে শিক্ষালাভ লাভ করে

---

[27] বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা কো অপারেটিভ জার্নাল।

দেশে ফিরলেন তখন তিনি ইউরোপীয় সমবায় ধারনায় সম্পৃক্ত হয়ে ১৯০৬ সালে রাড়ুলির নিকটবর্তী ৪১ টি গ্রামে অসীম দায় বিশিষ্ট প্রাথমিক কৃষি সমিতি গড়ে তোলেন। এই সমিতিগুলিকে একত্রিত করে ১৯০৮ সালে রাড়ুলি গ্রামে সেন্ট্রাল কো-অপরাটিভ ব্যাঙ্ক গঠিত হয়, যা সমবায় গঠনের এক আদর্শও বটে। গ্রামীন অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি ধনতান্ত্রিক নীতির চেয়ে ক্রেডিট ইন্সটিটিউশনের কথা বলেছেন।গ্রামীন সমবায়ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাথে মিলিতভাবে গ্রামীন অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।তিনি শিল্প সমবায় সম্পর্কে ১৯১৭সালের জুন মাসে ভারতীয় শিল্প কমিশনের কাছে পেশ করা বক্তব্যে বলেন – ‘যে শিল্পগুলির সর্বাপেক্ষা বিকাশ ঘটানো যায় সমবায়ের মাধ্যমে সেগুলি হল হস্তশিল্প, কুটির শিল্প ও কৃষি। সরকারী অফিসারদের সহায়তা ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রদর্শন অথবা গৃহশিল্পের প্রয়োগের চেষ্টা খুব ভালোভাবে করা যায় সমবায়ের মাধ্যমে’।[28] আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও সমবায়ের ব্যাপ্তির কথা বলেছেন।তিনি বলেন পৃথিবীর সকল অশান্তির ও কোলাহল দ্বন্দ্বের মাঝেও কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে এই আন্দোলন চলছে। ভারতবর্ষ এই আন্দোলনের সঙ্গী।

শুধুমাত্র কৃষিশিল্পে নয় তিনি বুঝেছিলেন যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের সমবায়ের প্রয়োজন আছে। সেইজন্য তিনি ১৯০১ সালে ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ' যা ১৯১৭ সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল সমবায় সমিতি' নামে আজও চালু আছে। আবার ১৯১৮ সালে ‘দ্য বঙ্গবাসী কলেজ কোওপারেটিভ ক্যান্টিন অ্যান্ড স্টোর’ প্রতিষ্ঠাও আচার্য দেবের উদ্যোগেই হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সাহায্য করেছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ গিরিশ চন্দ্র বসু ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সত্যেন্দ্র নাথ দে। তিনি

---

[28] Ray P C, Essay and Discourses C H, Government and Indian Industries, p. 240

বুঝেছিলেন যে, যদি ছাত্রদের মধ্যে সমবায়ের আদর্শের বীজ বপন করা যায় তাহলে সমবায়ের বিকাশ দীর্ঘস্থায়ী হবে। তিনি ১৯২ টি কলেজের ছাত্রদের নিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করেন যার সভাপতি ছিলেন নিজেই। তিনি সমবায় আন্দোলনের মহান আদর্শে উদবুদ্ধ করে ছাত্রদের আত্মনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি দুগ্ধ সমবায় ও আন্টি ম্যালেরিয়া সমিতি স্থাপনেও উদ্যোগী হন। অতএব আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সমবায় আন্দোলনকে রক্ষা ও আন্দোলনের আগ্রগতির স্বার্থে এই মনীষীদের তত্ত্ব, ধ্যান ধারনা এবং আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর চর্চা ও প্রয়োজনীয় প্রয়োগ মানব উন্নয়নের স্বার্থে জরুরি।

অশ্বিনী কুমার দত্ত:-

ভারতের ওপর এক মনীষী অশ্বিনী কুমার দত্ত বরিশালের শোচনীয় দুর্দশা দেখে মর্মাহত হয়ে দুর্নীতি রুখতে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলেন। ফলে সমাজের নিচুস্তরে থাকা পালকি, হুক্কা, ছত্রবহনকারী বেয়ারাদের লুপ্তপ্রায় কর্মসংস্থানগুলিকে সমবায়মুখী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে জীবিকানির্বাহ করার কথা তিনি বলেছেন। সমবায় সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, যেমন- নৌকার মাঝি, মামলাকারি, দুগ্ধবিক্রেতা, পানবিক্রেতা প্রভৃতি সাধারণ লোকজনের মধ্যে সত্য, প্রেম, পবিত্রতার মন্ত্র দ্বারা সবাইকে সমবায়মুখী করে তোলার কথা বলেছেন যাতে তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত হতে পারে। এভাবে সকলের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে অর্থশক্তিতে রূপান্তরিত করে এক নতুন সমবায় সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। অশ্বিনী কুমার দত্ত-এর অসামান্য কর্মসৃজনের স্মারক

হিসেবে 'অশ্বিনীমেলা'[29] আজও বাংলাদেশে প্রচলিত এবং সেখানে বোঝানো হয় সমবায়ের প্রসারে সাধারণ মানুষের কী লাভ। তিনি আরও বলেছেন যে, সমবায় শুধু পুরুষদের নিয়ে গঠিত হলে চলবে না, সমবায় সমিতিতে নারীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাঁর 'স্বদেশবান্ধব সমিতি' ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।এই সমিতির মধ্যেই নিহিত ছিল সমবায়ের বীজ। সে বীজ পরবর্তীকালে মহীরুহে পরিণত হয়ে সারা দেশ জুড়ে সমবায়ের মহিমা প্রচার করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ-

ভারতবর্ষ তথা বাংলায় সমবায় ভাবনার অন্যতম একজন গুরুত্বপূর্ণ মনীষী হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি দেশের দুর্দশার পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে গ্রামভিত্তিক কৃষিনির্ভর এই দেশে কৃষির উন্নতি না হলে পল্লীর উন্নতি সম্ভব নয়। আর পল্লীর উন্নতি না হলে দারিদ্রমুক্ত সমাজ তৈরি করা সম্ভব নয়। আর এই কৃষির উন্নতি হিসাবে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা যাছে মূলধনকে এবং আর এই মূলধনের অভাব পূরণ করতে গিয়ে তিনি সমবায় পদ্ধতির কথা বলেছেন। স্বল্প মূলধনবিশিষ্ট দরিদ্র এই দেশে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান গঠনের নানা অসুবিধা থাকায় সমবায় সমাজের অর্থনৈতিক উত্তরণে একটি আদর্শ পন্থা। সমবায়কে রবীন্দ্রনাথ আবার বৃহদায়তন ও অতিক্ষুদ্র উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে একটা ভারসাম্য হিসাবে লক্ষ্য করেছেন। তিনি পল্লীসমাজের লোকেদের রাষ্ট্রশক্তির বদলে যৌথ প্রচেষ্টার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আবেদন-নিবেদন বা সরকারী নিয়ন্ত্রণের চেয়ে জনগোষ্ঠীর সচেতন প্রয়াস অনেক বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি ক্ষুদ্র চাষির ক্ষুদ্রায়তন জমি ও কম

---

[29] ডঃ অসীম কর্মকার,ভান্ডার, মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও সমবায়,২০১৯,জানুয়ারি,পৃ-২৭

মূলধনের সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ চাষের কথা বলেছেন। যেমন- আখ চাষীদের দ্বারা সমবায় ভিত্তিতে কল কিনে আখ-মাড়াই, পাট চাষিদের একত্রে প্রেসের সাহায্যে পাট বাঁধাই,সমবায় ভিত্তিতে গো-পালন ও মাখন, ঘৃত ইত্যাদি উৎপাদন ও বিক্রি। এখানে উল্লেখ্য, ডেনমার্কের গোয়ালারা সমবায় ভিত্তিতে মাখন, পনির, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি উৎপাদন ও বিক্রি করে কীভাবে সারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। গ্রামীণ চাষিরা ঋণ শোধ করতে না পারায় পতিসারে গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক যখন দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল তখন তিনি নিজের নোবেল পুরষ্কারের পুরো টাকাটাই এই ব্যাংককে দিয়েছিলেন যাতে পুনরায় আবার এই ব্যাংকটি চলতে পারে।[30] তিনি সমবায় নীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মত দেশে শুধু ঋণ দান করেই কর্তব্য শেষ করে দেওয়ার সঙ্গে একমত হতে পারেননি| তিনি কৃষিজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্যবস্থাপনা, বিপনণ সবই সমবায়ের নীতির আওতায় আসবে বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ চাষ প্রবর্তনের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এবং সেখানে তিনি গরীব চাষিদের মানসিক উদ্যোগহীণতার ছবি তুলে ধরেছেন| এর সাথে তিনি তুলনা করেছেন রাশিয়া, আমেরিকার মতো দেশের সমবায় নীতিগুলিকে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের দেশের ১৯৫৯ সালে নাগপুর কংগ্রেসে যত শীঘ্র সম্ভব সমবায় পদ্দিতে যৌথ চাষ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও চাষিদের অশিক্ষা এবং দক্ষ পরিচালকের অভাবের জন্য তা পুরপুরি সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমবায়নীতিতে বলেছেন যে, ‘ যে দেশে গরীব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে চেয়ে দরকার হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া’। Michael Todaro তাঁর “Economic

---

[30] মঞ্জুলা বসু, সমাজ অর্থনীতি ও রবীন্দ্রনাথ, টেগোর রিসাচ ইনস্টিটিউট,২০১৭, পৃ-১৫।

Development of the Third World” গ্রন্থে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতির একটি আবশ্যিক শর্ত হল মনের অসহায়তা, দাসত্ব, অজ্ঞান ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি।[31]

জওহরলাল নেহরুঃ-

নেহরুর সমবায় ভাবনা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। তিনি ভারতের স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন পরিকল্পনার ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে সমবায়ী ভাবনা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এটার প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি সংগ্রাম ও বর্জন প্রক্রিয়া ছাড়া গনতান্ত্রিক উপায়ে বন্ধুত্ব পূর্ণ সমবায় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটানোর কথা বলেছেন। I তিনি সমবায় আন্দোলনকে মানব উন্নয়নের সুদুর প্রসারি বলেছেন এবং জমি ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেও তিনি সমবায়ের বিস্তার ঘটানোর কথা বলেছেন। বড় ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য ছোট ছোট সংগঠিত ক্ষেত্রে সমবায় কেন্দ্রিকরনের ধারনাটি নিয়ে এলেন। তিনি আরও বলেন যে, ক্ষুদ্র ইউনিটগুলি যদি সমবায় প্রথায় ঐক্যবদ্ধ না হয় তাহলে বড় ইউনিটের বিপরীতে টিকে থাকতে পারবে না। সমবায় পদ্ধতি তাদের সেই সুবিধা দেবে।[32] বড় ইউনিটগুলি কেন্দ্রীভুত উপায়ে যা পেয়ে থাকে। ১৯৫৮ সালে তিনি বলেন যে সমবায়ের মাধ্যমে মানুষ তাঁর নিজের স্বার্থপরতাকে ত্যাগ করে সকলের জন্য কাজ করার বা সকলের জন্য ভাবার কথা শেখাবে। তাই তিনি বলেছেন যে, প্রতিযোগিতা ও দখল জীবনের আইন হবে না, হবে সহযোগিতা। প্রত্যেকের ভালোটি সকলের ভালোর জন্য দেওয়া। সাধারন মানুষ নিজের ইচ্ছায় সমবেত হয়ে নিজের

- [31] Michael P. Todaro, ‘Economic Development in the Third World’, Pearson Education Limited,1989, pp.-54

[32] Speeches of Jawaharlal Nehru, 3rd vol., Information and Publication Ministry, Govt. of India, p.-8

সমস্যাগুলিকে সমবায়ের গঠনের মাধ্যমে সমাধান করবে। এই আন্দোলনের মধ্যেই রয়েছে এক আত্মশক্তির কেন্দ্রিকতা। প্রকৃত সমবায়ের কাজ হবে সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগের মাধ্যমে জনসাধারনের বিকাশ ও দায়িত্ব ও সামাজিক সংহতি বজায় রাখা। বর্তমানে ভাবনার বিষয় হল এত দিন ধরে সমবায় আন্দোলন হলেও কিন্তু সাধারন মানুষকে বা গ্রামের সমস্ত প্রান্তিক মানুষকে সম্পদের পরিমানের কথা বাদ রেখে সমবায়ের আঙিনায় আনার বড় প্রচেষ্টা হয়নি। কিছু যদি হয়ে থাকে তা ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে Univershal Membership এর মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের একটি মাইল ফলক বলা যায়।[33]

অতএব আমরা দেখি যে, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু সমবায় ভাবনা শুধু ভারতবর্ষে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। তাই আবার বলা যায় যে প্রথম থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্র ও উন্নয়নের নীতির নির্ধারক। পরবর্তী পরিকল্পনাতে তেমনভাবে উন্নতির কোন প্রভাব চোখে পড়েনি। যা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করবো।

পরিশেষে বলা যায় যে বাংলার নতুন আর্থসামাজিক পরিবেশ তৈরির পথিকৃৎ হিসাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পতিসরে কৃষিব্যাংক তৈরি করে নিজের নোবেল পুরস্কারের অর্থ জমা রেখে সেই অর্থ থেকে কৃষকদের ঋণ দিয়ে সমবায় আন্দোলন শুরু করেছিলেন। নিজের সন্তানকে তখনকার দিনে অন্যদের মতো ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার না করে কৃষিবিজ্ঞানী করে তুলতে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। হ্যামিলটন সাহেব সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের কৃষকদের সমবায়ী প্রথায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে বাংলার সমবায় আন্দোলন অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যেত। ভারতীয়

---

[33] ibid

সভ্যতার বীজ যে কৃষির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা ভারতীয়রা প্রায় ভুলতে বসেছিল। তাই এই রাজ্যেও পালাবদল ঘটেছে কৃষি-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এখনও কৃষকদের প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে রাখায় রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে কিছুটা শান্ত হয়েছে রাজ্য। জাতীয় সার্বিক বিকাশের প্রশ্নে অর্থনীতি একটা বড় ভিত্তি। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি এই বাংলায় তো কৃষিনির্ভর অর্থনীতিই প্রধান ভরসা। তাই প্রজাতন্ত্রের ইনারহুইল এই কৃষিকে আজ নতুনভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা জরুরি। আর এই কাজে দীর্ঘদিন ধরে সমবায় যেভাবে আন্তরিক প্রচেষ্টার হাত বাড়িয়ে রেখেছে তা আরও সচল ও গতিশীল করা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রামীণ সমবায়গুলি দারুণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলছে। এই কর্মপদ্ধতি থেকে কর্মচারীদের বিষয়ে যদি সরকার ও প্রশাসন একটু সদর্থক চিন্তা করে তাহলে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও গতিশীল হয়ে উঠবে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক-শ্রমিকরা ভরসার জায়গা পাবে। তারা নিজেদের স্বল্প বুদ্ধি প্রয়োগে আত্ম-নির্ভর হওয়ার পথে সমবায়ের নানান সহযোগিতা পাবে। সমবায় তো এখন আর আমূল, ইফকো, কৃভকো এই সব সফল সমবায় নিদর্শনকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না, বরং গ্রামের প্রত্যেক কৃষক সমবায়ের স্নেহস্পর্শ পাক তা-ই চাইছে। তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে একশো দিনের কাজ, সবেতেই সমবায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রজাতন্ত্রের উল্লাস তখনই সার্থক হবে যখন এই সমবায় সাফল্যকে গ্রামের প্রান্তিক রেখা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। নিবিড় কৃষিকাজের মধ্যে দিয়ে কৃষকরা যদি উৎপন্ন ফসলের সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে , তাহলে সারা দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ সমৃদ্ধতর হবে।

সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসঃ-

পৃথিবীর ইতিহাসে সমবায় আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ একটি ঘটনা। শিল্পবিপ্লবের যুগে ইংল্যান্ডে প্রথম দরিদ্র মানুষদের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে 'সমবায় আন্দোলনের জনক' রবার্ট আওয়েন সমবায় ভাবনার উত্থান ঘটান। পরবর্তী সময়ে জার্মানির সমবায় ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঋণ গ্রহনের মধ্যে দিয়ে। পৃথিবীতে প্রথম সমবায় ভাবনা চালু করে ডেনমার্ক। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেও সমবায়ের ভাবনার সন্ধান পাই। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে রচড়েল পল্লীর ২৮ জন শ্রমিক ১৮44 এর ২৪ এ অক্টোবর ২৮ জন তাঁতি শ্রমিককে নিয়ে পৃথিবীর প্রথম সফল সমবায় সমিতি গঠন করে যার নাম হয় 'দি রচডেল সোসাইটি ইকুইটেবেল পাইওনিয়ারস'। ১৮৫২ সালে একে Instrial and provident Societies Act এর মাধ্যমে আইনি সম্মতি দেওয়া হয়।[34] অপরদিকে অনবরত প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বাজারের ওপর ইহুদিদের নিয়ন্ত্রনের জন্য উনবিংশ শতকে জার্মানির কৃষক ও কারিগরদের অবস্থা ছিল যথেষ্ট শোচনীয় ও ঋণভারে জর্জরিত। ফলে ফ্রেডরিক উইলিহেম রাইফিজন(১৮১৮-১৮৮৮) ও ফ্রাঞ্জ সুলজ(১৮০৯-১৮৮৩) ১৮৫২ সালে সমবায় সমিতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে কৃষক ও কারিগরদের মুক্তি দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় ১৮৮০ সালে জার্মানিতে এরকম বহু সমিতির উত্থান ঘটে। ইংল্যান্ড ও জার্মানির দেখাদেখি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও এই সমতির উত্থান ঘটে।

---

[34] সমবায়ের ইতিহাস, পঞ্চায়েতী রাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র, কলকাতা,প্রথম সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ, জানুয়ারি ২০১৪

যেমনঃ-

ডেনমার্কঃ- এখানে স্টিলিং অ্যান্ডারসন এর হাত ধরে পৃথিবীর প্রথম দুগ্ধ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানকার মানুষ কৃষিতে লাভ না করতে পেরে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল। আর তখন ইংল্যান্ডে এর চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। এইভাবে ডেনমার্কে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমবায় আন্দোলন গতি পায়।

জাপানঃ- **১৮৭৮** সালে সেরিকালচার সোসাইটির মধ্যে দিয়ে জাপানে প্রথম সমবায় সমিতি গঠিত হয়। পরে বহু সমস্যার মধ্যে দিয়ে সমিতিগুলি সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমবায় আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয় মৎস্য শিল্পকে কেন্দ্র করে।

সুইজারল্যান্ডঃ- **১৮৫০** সালে ডিস্টিক কমোডিটি বাইং মানে একটি সমবায় সংস্থা গঠন করেছিল। পরবর্তী সময় বিশেষ করে **১৮৯৯** সালে সূইডিশ কো- অপারেটিভ ইউনিয়ন ও হোল সেল সোসাইটির হাত ধরে সমবায় আন্দোলন।[35]

ইজরায়েলঃ- এখানে খামার সমবায়ের মাধ্যমে যে সমবায় আন্দোলন হয়েছিল তার **৩** টি পর্যায় রয়েছে। সেগুলি হল- সমবায় খামার, যৌথ খামার, স্টোর কেন্দ্রিক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো ভারতবর্ষেরও সমবায়ের একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগে মহেঞ্জোদারোতে যে বৃহৎ শস্যাগার পাওয়া গেছে তা আমাদের ধর্মগোলার সমান। পরবর্তী সময়ে আমরা বৈদিক যুগে ‘শ্রেষ্ঠীন’ শব্দের অর্থের মধ্যে দিয়ে সমবায়ের

---

[35] তদেব,

উপস্থিতির ইঙ্গিত পাই। জাতকে ১৮ রকমের সমবায় সংগঠনের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও কারিগরদের সঙ্ঘের মাধ্যমে উপার্জনে সমবন্টনের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক কার্ল হিটগেলের লেখাতে জনসমিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের সেচ এবং নন্দরাজার সুদর্শন সাগরও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও আখ চাষে ‘কুনি’ এবং ‘গাঁতা’ ও পাঠানীর উল্লেখও আমরা বিভিন্ন সময়ে পাই। এছাড়াও গ্রাম বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গ্রাম্য বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে ‘চণ্ডীমণ্ডপ’ হল সমবায়ের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। পাটশিল্প থেকে শুরু করে সুপারি বিক্রয়, নদী ফেরার ব্যবস্থাপনায়, তীর্থ যাত্রায় সমবায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহন করত। ১৯০৪ সালে ভারতে সমবায় আইন চালু হলেও এর আগে আমরা ১৮৭৩ সালে আসানসোলে ই আই আর কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এবং ১৮৮২ সালে ও দ্বিতীয় সমিতি গঠিত হয়েছিল।[36] এরপর একে একে আরও অনেকগুলি সমবায় সমিতি গঠিত হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহের পর সরকার কৃষকদের কিছু করার জন্য ১৮৯২ সালে এক রিপোর্টের ভিত্তিতে ফ্রেডরিক নিকলসনের দ্বারা জার্মান সমবায় সমিতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। ফলে ১৯২৪ সালে সমবায় আইন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। বাংলাতে তখন ১১ টি কৃষি সমিতির উত্থানও লক্ষ্য করা যায়। যদিও ১৯০৭ সালে কোনোরকম সরকারী অনুদান ছাড়াই মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক পাশাপাশি অঞ্চলের সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দিচ্ছে এবং পরবর্তী সময়ে সেই ব্যাংক আবার শীর্ষ ব্যাংকের মর্যাদাও পাচ্ছে। এই ভাবেই মোটামুটিভাবে

---

[36] তদেব,

ভারতবর্ষে একে একে প্রতিটি রাজ্যে সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সমবায় আন্দোলন প্রসার লাভ করছে।

ভারতে সমবায় আইনের পটভুমিঃ-

এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকরা তাদের নিজেদের দেশের কারখানাগুলির কাঁচামালের জোগানের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে হলে এই শোষিত ও নিপীড়িত কৃষকদের স্বার্থে কিছু রিলিফ দেওয়ার কথা বলে যার উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই ‘ডেকান এগ্রিকালচারাল রিলিফ অ্যাক্ট ১৮৭৯’, ‘ ল্যান্ড ইম্প্রুভমেন্ট লোন্স অ্যাক্ট ১৮৮৩’, ‘এগ্রিকালচারিস্ট লোন্স অ্যাক্ট ১৮৮৪’ এই আইনগুলি 'তাকাভি আইন' নামেও পরিচিত ছিল। প্রথমের দুটি আইনে কৃষকদের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। বরং কৃষককুল একের পর এক ঋণ শোধ করতে না পেরে বেশি করে মহাজনী ঋণের শিকার হচ্ছে। একদিকে ঋণ আদায়ের জুলুম অন্যদিকে কৃষি ঋণ না পাওয়ায় কৃষকদের জীবনে দুর্দশা ও ক্ষোভ বাড়তে লাগল। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার সাধারন মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য ১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠন করতে লাগলো। কিছু দিন পরে রিপোর্টে জানা গেল যে সমস্ত জমির মালিকের ১/৩ অংশ জমিদারের ফাঁদে, এখান থেকে বেরিয়ে আসা যথেষ্ট কঠিন। আবার ২০ বছর পর ১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন বসল এবং সেখানে বম্বে প্রেসিডেন্সীর সচিব জানাচ্ছেন যে- ব্রোচের শতকরা ২৮ ভাগ জমি মহাজনদের কবলে চলে গেছে।[37] আবার আমেদাবাদের চিত্রটাও সমান। মোট কথা, বম্বে প্রেসিডেন্সির শতকরা ১/৫ জমি ঋণের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মহাজনের কবলে পড়েছিল।

---

[37] Bombay Banking Enquiry Committee Report, Vol. I, pp.86-87

১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কমিশন গ্রামে গ্রামে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথা বলে। কৃষকের কৃষি নীতি থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে সুবিধা, আবার এই কৃষকদের মহাজনদের শোষণ শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে জুলুমবাজি বন্ধ করার জন্য প্রথমে কমিশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিল তা হল-

১) কৃষির জন্য সদস্যবৃন্দ যাতে ঋণ পায়।

২) কৃষকদের ক্ষুদ্র জমানো অর্থ যাতে নিরাপদে সঞ্চিত থাকে।

৩) উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়া যাবে না।

৪) সমস্ত কৃষি বিষয়ে গ্রামীণ জনগনের মধ্যে সমবায় কে তুলে ধরা।

আমরা দেখি যে বিশেষ কিছু নীতি প্রকাশ করে যাতে করে কমিশন কৃষি ব্যাঙ্ক গুলিকে সঠিক ভাবে চালাতে পারে।–

১) সদস্যবৃন্দরা যৌথভাবে সমিতির সর্বক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে।

২) কাজের এলাকার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকবে।

৩) ব্যাংকের কাজের সমস্ত সেরা অবৈতনিক হবে।

৪) সমস্ত নিট লাভ বণ্টনযোগ্য কিন্তু লভ্যাংশ হিসাবে নয়, সংরক্ষিত তহবিলে জমার যোগ্য কিন্তু ভাগভোগ্য নয়।

অতএব এসবই কিন্তু বেশ ভাল দিক কমিশন তৈরি করে দিল সাধারন জনগনের জন্য কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা এই নীতিগুলিকে সফল হতে দিল না।

যদিও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর লর্ড অয়েনলক **১৮৯২** সালের মার্চ মাসে মাদ্রাজে কৃষি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য মাদ্রাজের কালেক্টর মিঃ ফ্রেড্রিক অগাস্টাস নিকলসনকে দায়িত্ব দেন। তিনি জার্মানি সহ ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরে **১৮৯৫** সালে ভূমি এবং কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের সম্ভাবনা শীর্ষক প্রথম প্রতিবেদনে একটি যুগান্তকারী রিপোর্ট পেশ করেন।[38] তবে পরবর্তী সময়ে এই রিপোর্টটি বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বাতিল করেন তৎকালীন মাদ্রাজ পরিষদ। পরবর্তীকালে আবার মিঃ ডুপার নেক্স যুক্ত প্রদেশের পরীক্ষা চালিয়ে একটি প্রতিবেদন উত্তর ভারতের জনগন ব্যাঙ্ক নামে শিরোনাম প্রকাশ করে। বঙ্গদেশে প্রাদেশিক সরকার কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য মিঃ পি সি নায়নকে নিয়োগ করেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ডুপারনেক্স এর তৈরি ব্যাঙ্কগুলিকে দেখে এসে বঙ্গদেশে কয়েকটি স্থানে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন এবং এই সময় পাঞ্জাবেও কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই বিক্ষিপ্ত ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপকে খতিয়ে দেখার জন্য বিশেষ কতগুলি কমিটি তৈরি করেছিল-

১) স্যার এডওয়ার্ড ল।

২) ফ্রেড্রিক নিকলসন।

৩) জে বি ফুলার।

৪) আই উইলসন।

৫) রেজিন্যল্ড মুরে।

৬) এইচ দুপারনেক্স।

---

[38] অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশ্ন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস বাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা, পৃ,৯৪-৯৫

পরবর্তীকালে এই কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন ভারত সরকারের রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সেক্রেটারি। বিভিন্ন পর্যালোচনা করে ল কমিটির সমবায় ঋণ দান কমিটির সুপারিশ করে কৃষি ব্যাংকের নাম পরিবর্তন করে সমবায় ঋণ সমিতি (Cooperative Credit Society) নাম রাখেন। এর সাথে ইংল্যান্ডের ফ্রেন্ডলি সোসাইটিজ অ্যাক্ট ও ইন্ডাসট্রিয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটিজ অ্যাক্ট অনুসারে তৈরি একটি বিল বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। এই বিলটি প্রতিটি প্রদেশে পাঠানো হয় এবং পুরসমবায় ব্যাঙ্ক গড়া যায় কিনা সে সম্পর্কে মতামতও নেওয়া হয়। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন এক ভাষণে বলেন যে, ঋণগ্রস্থ দরিদ্র জনগনই তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে। সরকার তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সদস্যদের সাহায্য দেবে। প্রধান উদ্যোগ হিসাবে কোওপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অথবা সাধারন ভাবে বলা হয় কৃষিব্যাঙ্ক এর সদস্য হিসাবে সাধারন জনগনই প্রধান ভূমিকা নেবে। সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য কিভাবে দেওয়া হবে তা নিয়েও স্যার ইবেটসন বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে সমবায় তৈরি হবে নিচু স্তর থেকে, ওপর থেকে নয় এবং সরকার এই সমিতিগুলিকে অগ্রিম হিসাবে পঞ্চাশ টাকা দেবে এই শর্তে যে মোট বাকি অগ্রিম অর্থ কখনোই সদস্যদের দেওয়া অংশ ও আমানতের থেকে বেশি হবে না, বা ২০০০ টাকার বেশি হবে না একটি একক সমিতির ক্ষেত্রে।[39] অতএব প্রথমে শর্তটি মূলধনকে দ্বিগুন করবে।সমিতি প্রথম তিন বছরের জীবনে এই অর্থের জন্য কোন সুদ লাগবে না ও তিন বছরে অগ্রিম অর্থ ফেরত দিতে হবে না, যদি না এর মধ্যে সমিতি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ের পরে শতকরা ৪ টাকা সুদ দিতে হবে ও পাওনা অর্থের ১/১০ অংশ হিসাবে বার্ষিক কিস্তির ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে। এই বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনা করে ১৯০৪ সালের ২৩ সে মার্চ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মি.

---

[39] তদেব

অ্যাডামসন,মি. কেবল, মি. গোখলে, রাই শ্রী রাম বাহাদুর, মি. এডওয়ার্ড ল, ও নবাব সৈয়দ মহম্মদের উপস্থিতিতে সভাপতির পদে ছিলেন লর্ড কার্জন । পরিশেষে বিলটি ১৯০৪ সালের ১০ ই নভেম্বর আইন দ্য কোওপারেটিভ সোসাইটি অ্যাক্ট ১৯০৪(The Cooperative Credit Societies Act.1904)(Act no-10 of 1904) বা সমবায় ঋণ সমিতি সমূহের আইন, ১৯০৪ সালের ২৫ সে মার্চ বড়লাটের সম্মতি লাভ করে। ১৯০৪ সালের ২৬ সে মার্চ ভারতীয় গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ভারতে প্রথম সমবায় আইন চালু হয়।[40]

এই সমবায় আইনের আবার দুটি ভাগ ছিল। একটা হল সসীম দায় বিশিষ্ট, আর অন্যটা হচ্ছে অসীম দায় বিশিষ্ট। প্রথমের দিকে কৃষক বুঝতে না পারলেও, পরবর্তী কালে এই অসীম ও সসীম এর পার্থক্য বুঝতে পারল। এগুলি মূলত বিদেশি রাষ্ট্রের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রিটিশ সরকারের ‘ ভাগ কর আর শাসন কর’(Divide and Rule) নীতি, আসলে একই উপজাতি, একই শ্রেণি, একই জাতির মধ্যে নিবন্ধকের অনুমতি সাপেক্ষ সমবায় গড়ার নির্দিষ্ট অধিকার দেয়।[41] এই আইনে কৃষকের কৃষকের বর্তমান দেনা মেটানোর কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। ফলে বহু কৃষক সদস্যপদ লাভ করেও সমবায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। এইভাবে সরকারি সাহায্যের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু গরীব চাষিদের কতখানি সুবিধা হয়েছিল তা কিন্তু প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে।

১৯০৪ সালে এই সমবায় আইন ব্রিটিশ রাজ্য সমবায়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রূপ ধরে এগিয়ে গিয়েছে। কিছু কিছু প্রশ্ন সমবায় আইনে দেখা গিয়েছে-

---

[40] The Gazette of India, March 26, 1904, Part-IV, pp. 23-24

[41] The Cooperative Societies Act, 1904, Section 3(2)

১) কৃষকদের আত্মনির্ভরশীল করার কাজ কতটুকু এগিয়েছে?

২) এক উপজাতি, এক জাতি, এক গোষ্ঠী, এক পাড়া বা গ্রাম এক গ্রাম গোষ্ঠী নিয়ে ছোট ছোট সমবায় তৈরির সুযোগ ছিল।আইন সেক্ষেত্রে কতটা সাফল্য পেয়েছে?

৩) আসিম দায় বিশিষ্ট সমবায় তৈরির জন্য আইনের নির্দেশিকা আন্দোলনে ক্ষতি করেছিল কি না?

৪) এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে দরিদ্র নিষ্পেষিত, অশিক্ষিত, আর্থিক দুর্বলতা গ্রস্ত দেনায় জর্জরিত কৃষকদের পক্ষে সমবায় আন্দোলন নিজে কতখানি ভূমিকা পালন করেছিল?

পৃথিবীর ইতিহাসে সমবায় আন্দোলন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ঘটনার সাথে যুক্ত। তাই ব্রিটিশ ভারতে সমবায় আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করতে গেলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমবায় আন্দোলন এসে পড়ে। এবারে ইউরোপের অন্যান্য দেশের আন্দোলনের সাথে বাংলার সমবায় আন্দোলন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হবো।

বঙ্গদেশে সমবায়ঃ-

বঙ্গদেশে সমবায় আন্দোলন শুরু হয় আই,সি এস মি, ডব্লু আর গৌড়লে এর হাত ধরে। ১৯০৪ সালের ৬ ই সেপ্টেম্বর তিনি বাংলা, বিহার, ওড়িশার সমবায় সমিতি সমূহের নিবন্ধক নিযুক্ত হন। সে সময় ৮০ হাজার গ্রাম ও ২৩ টি জেলা নিয়ে গঠিত ছিল বঙ্গদেশ। কৃষিকাজ ছিল এই দেশের মূল জীবিকা। কৃষি জমির সিংহ ভাগ ছিল জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের মালিকানাধীন। তাই কৃষকের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৯১৪ সালে পঞ্চানন দাস মুখোপাধ্যায় ভারতের কৃষকের বাস্তব পরিস্থিতির খুব বর্ণনা করেছেন কবিতায়-

“শতাব্দীর ভারে হল তার ন্যুব্জ দেহ।

মুখে কালের শূন্যতা

পিঠে পৃথ্বীর বোঝা

অনিমেষ দৃষ্টিতে তার ধরণীর গেহ”।[42]

তিনি সমবায় সমিতির নিবন্ধক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠাও করতে থাকেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশে ক্রেডিট সমবায়ের নিবন্ধ শুরু হয় ও ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গ দেশে ৫৭ টি ক্রেডিট সমবায় নিবন্ধিক্রিত হয়। এর মধ্যে বঙ্গদেশে ছিল ২২ টি। সমবায়ের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ৫০ এর মধ্যে। এই সময় লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে আসাম নামে প্রদেশ সৃষ্টি কে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশে শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। স্বাভাবিক ভাবে এই আন্দোলন সমবায় আন্দোলনের উপরেও প্রভাব ফেলে।সরকারের সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গে জনগন সমবায় আন্দোলনকেও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে ও মনে করে সমবায় বিদেশি সরকারের খাজনা আদায়েরই কোন ব্যবস্থা। প্রথম সমবায় আইন চালু হওয়ার পর ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলিতে সদস্য সংগ্রহ ও সমিতি গঠনের বিবরন নিচে আলোচিত করা হল।

বঙ্গদেশে সমবায় সমিতি প্রথম গড়ে ওঠে বলরামপুর রুরাল কোওপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, ১৯০৫ সালের ২৮শে মে সমবায় নিবন্ধীকৃত হয় মেদিনীপুরের খেলাড এলাকার বলরামপুর সরকারি তালুকে। এর জন্য সমবায় এস্টেট থেকে ৩৩০ টাকা ধার নেয় হ্যমিল্টন

---

[42] অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় , সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা, পৃ,১০৭

এস্টেট থেকে এবং ১৯১০-১১ সাল পর্যন্ত খেলাড সমিতিটি বঙ্গদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ সমিতি হিসাবে গণ্য হয়েছিল।[43] নিবন্ধক এই সমিতির প্রশংসাও করেন। ১৯০৪-৫ সাল থেকে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন তার সবলতা দুর্বলতা নিয়েই গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে এই আন্দোলন কতটা কার্যকারী হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে যে যাই বলুক না কেন এই আন্দোলন মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাঁচার একটা রাস্তা করে দিয়েছিল। গ্রামীণ দলাদলি ভুলে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে একসাথে বাঁচার শক্তি জোগাল। কৃষক সমবায় থেকে ঋণ নিয়ে চড়া সুদে মহাজনী ঋণ শোধ করতে লাগল। গ্রামের ছোট ছোট সমস্যাগুলি নিজেরা মীমাংসা করে নিত সমবায়ের দ্বারা। গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে উৎসাহ দিত সমবায়। গ্রামের মানুষ গ্রামে পাঠশালা তৈরিতে উদ্যোগ নিতে লাগল। সমস্ত ভালো খারাপ নিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠতে লাগল সমবায়। ধীরে ধীরে গ্রামীণ মানুষের ভরসার জায়গা হয়ে উঠল সমবায়।

আমরা জানি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ পুরোপুরি যোগ না দিলেও পরোক্ষ ভাবে যোগ দিয়েছিল। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব থেকে সমবায় আন্দোলন বাদ যায়নি। ১৯১২ সালে দ্য কোওপারেটিভ অ্যাক্ট চালু হওয়ার পরে ভারতের মতো বাংলাতেও বাধাহীন প্রসারণ ঘটে। এখানে দেখা যায় যে ১৯১৩-১৪ সালে বঙ্গদেশে সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪৯.০৩ শতাংশ। বাংলাতে সদস্য বৃদ্ধি হয়েছে ৭৬.৬৫ শতাংশ ও কার্যকারী মূলধন সংগ্রহ বৃদ্ধির হার ৮৯.৯৮ শতাংশ।

---

[43] তদেব,

তবে এই সময় সমবায় সমিতি গঠন, সদস্য সংগ্রহ, ও কার্যকারী মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যাটা ধীরে ধীরে কমেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়নে আমরা দেখি যে, বাংলা সহ ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলনের প্রচুর মানুষের অংশগ্রহন, ব্যাপক অগ্রগতি, সবলতা ও দুর্বলতাসহ মানব সভ্যতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয় পর্যায় হিসাবে আমরা দেখি যে, ১৯২৯-৩৮ সাল সারা বিশ্বে যখন এক অর্থনৈতিক মহামন্দা চলছে তার প্রভাব থেকে বাদ যায়নি ভারতবর্ষ সহ বাংলা প্রদেশ। এই অর্থনৈতিক মহামন্দা সমবায় আন্দোলনকে একেবারে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কৃষিজ ফসল ও কৃষিজমির দামের আকস্মিক পতনে সাধারন কৃষকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে আর এর প্রভাব পড়তে থাকে সমবায় সমিতির ওপর। সমিতিগুলির ওপর নেমে আসে চরম বিপর্যয়। তাদের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। ফসলের দাম না থাকায় কৃষকেরা আর সময় মতো ঋণ শোধ করতে না পারলে ঋণের পাহাড় জমে যায়। সমিতির সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, সমিতির কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই মহামন্দাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতাগুলিকে। এই সময় সমিতির ঋণ আদায়ের শতকরা হার ছিল ১৯২৮-২৯ সালে ৩৬,৭ শতাংশ। পরবর্তী পর্যায়ে তা কমে ১৯৩৭-৩৮ সালে হয়েছে ৬,4 শতাংশ। অন্য দিকে বকেয়া বেড়েছে বিপুল পরিমানে। ১৯২৮-২৯ সালের থেকে তিন গুন বেড়ে ১৯৩৭-৩৮ সালে হয়েছিল ৮৬,৬ শতাংশ। এর ফলে দাদন আর আয় দুই কমেছে। ফলে অনেক সমিতি বন্ধও হয়ে যাচ্ছে আবার অনেক কৃষক মহাজনদের খপ্পরে পড়ে ঋণের দায়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৩১-৩২ সাল থেকে নতুন সমিতি গঠন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই সময় ভূমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক স্থাপন ও দ্য রয়্যাল কমিশন অন এগ্রিকালচার (১৯২৮), দ্য সেন্ট্রাল প্রভিন্সিয়াল বাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি(১৯২৯) গঠনের মাধ্যমে এই ভেঙ্গে পড়া সমবায় সমিতি গুলির পুনর্গঠনে উদ্যোগ নিচ্ছে।[44] রয়্যাল কমিশন গঠনের বিশেষ কিছু নীতি গ্রহন করে কমিশন সমবায় নীতি ও সমবায়ের অর্থ সম্পর্কে সদস্যদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে উচ্চ শিক্ষিত ও ভালো প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলছে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের অনীহা ও বেসরকারি সমবায়ের প্রতিষ্ঠার প্রতি অনিচ্ছাই সমবায়ের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। যখন ১৯৩৪ সালে ভারতের ইতিহাসে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা সমবায় আন্দোলনকে এক অন্য মাত্রা এনে দেবে বলে ভাবা হলেও কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে ওই তথ্যগুলির অবস্থান বাস্তব থেকে অনেক দূরে। কিছু এলাকায় সমবায় আন্দোলন সাধারন মানুষের ধারে কাছেও নেই।

আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯৩৯-৪৬ যাকে এককথায় সমবায়ের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের কাল বলে চিহ্নিত করা যায়। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার জন্য কৃষি পন্যের দাম খুব বাড়তে থাকে। আবার খাবার আমদানিও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কৃষি থেকে কৃষকের আয় বাড়ে এবং কৃষকের ঋণ শোধের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। তার ফলে সমবায়ের আবস্থাও ভালো থাকে। ঋণ দানের চেয়ে ঋণ আদায়ের পরিমান বৃদ্ধি পায়। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেশি থাকায় ব্রিটিশ সরকার সমবায় সমিতিগুলিকে ব্যবহার করে রেশন ব্যবস্থা চালু করে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বম্বে, সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস, উত্তর প্রদেশ ও বঙ্গদেশ। তারা বেশি খাদ্য উৎপাদনের প্রকল্পও নিয়েছিল। এর পরে ১৯৪৫ সালে গঠিত হয়

---

[44] সমবায়মন্ত্রক, সহকারি সমাজ, ১৯৬২, পৃ- ১৬

সারাইয়া কমিটি।[45] যার আসল লক্ষ্য হল গ্রামীণ সমবায় সমিতি গুলির কার্যকলাপগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা। গ্রামীণ সমবায়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে গ্রামীণ কৃষক পরিবারগুলি। এই কৃষক পরিবারগুলির উন্নয়নের সাথে গ্রামীণ অর্থনীতি জড়িত।

এই পরিকল্পনাটি দুটি কাজ করত। একদিকে জনমত সৃষ্টি, অন্য দিকে পরিকল্পনার রুপায়ন করা। এই পরিকল্পনার বিস্তার ঘটেছিল। যেমন- কৃষি উৎপাদন, পশু পাখি পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি বিপনন, কৃষি ঋণ, ছোট ছোট শিল্প, শ্রম ও বাস্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে। সমিতির পুনর্গঠন যে রিপোর্ট আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে পাই তা হল-১৯৩৮-৪৬ সাল পর্যন্ত সমিতির সংখ্যা বেড়েছে ৪১% সদস্য বেড়েছে ৭০% ও কার্যকারী মূলধন বেড়েছে ৫৪% । এই সময় কিছু নতুন নতুন সমিতির উত্থান ঘটে যেমন- দুগ্ধ সরবরাহ কারী সমিতি, মোটর ট্রান্সপোর্ট সমিতি, আখ উৎপাদন কারী সমিতি, শিল্প উৎপাদন কারী সমিতি প্রভিতি।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, ভারতবর্ষ তথা বাংলা প্রদেশে সমবায় তত্ত্ব ব্রিটিশ মস্তিস্ক প্রসুত হলেও, এই ধারনা সাধারন কৃষক, শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্য বদ্ধ হয়ে সমবায় ধারনা কে ব্যবহার করে নিজের অন্তর্নিহিত যৌথ শক্তির সাহায্যে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার সাহস জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে,-“ আজকালকার দিনে অর্থ শক্তি বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকে পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ, অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহু লোকের কর্ম শক্তি কে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্ম শ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্ম শ্রম ই হচ্ছে সত্যি কারের মূলধন।এই কর্ম শ্রম ই প্রত্যক্ষ ভাবে আছে শ্রমিক

---

[45] Dwividi, Dr. R C, Hundred Years of Cooperative Movement in India, Vol. I, pp. 393-99

দের প্রত্যেকের মধ্যে, তারা যদি ঠিক মতো করে বলতে পারে যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব, তাহলে সেই হয়ে গেল মূলধন। অবশেষে একদিন দুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে আমাদের বিছিন্ন বল বলীর মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়ে তাকে বল দিয়েছে। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আমাদের সকলের কর্ম শ্রমকে মিলিত করে অর্থ শক্তিকে সর্ব সাধারনের জন্য লাভ করা। একেই বলে সমবায় নীতি"।[46]

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সমবায়ঃ-

ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করলো। পৃথিবীর সবথেকে বৃহত্তম গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। ভারতের দারিদ্রতা মোচনের জন্য নেহরু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা করলেন। ব্রিটিশ আমলে উন্নয়ন ছিল বিচ্ছিন্ন, অপরিকল্পিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। সমবায় আন্দোলনের ও বিকাশের পথ খুলে গেল সংবিধানের পূর্ণ বিকাশের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হল।–

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেহেতু ভারতে কৃষির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। তাই সমবায়কে হাতিয়ার করেই মানব উন্নয়ন করার কথা ভাবা হয়েছিল। এখানে আরও বলা হয় যে,-" কৃষি, ব্যবসা, অর্থ, বিপনন এবং শিল্প প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হবে সরকারি নীতির প্রধান উদ্দেশ্য"। সারাভারত ঋণ সমীক্ষা কমিটির **১৯৫৪** সালের প্রতিবেদনে বলা হয়,- 'সমবায় অসফল, সমবায় সফল হবেই' এবং কমিটির সুপারিশগুলি বিশেষকরে সমস্ত স্তরের সমবায়ের শেয়ার মূলধনে অর্থনৈতিক অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সমবায় রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ সমবায় আন্দোলনকে সুদুর প্রসারী করেছিল। আবার আমরা দেখি যে জওহর

---

[46] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায় নীতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ-৪০-৪১

লাল নেহরু সমবায় সম্পর্কের সরকারি নীতির আত্মসমালচনা করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশগুলি যেমন সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে জেতে সাহায্য করেছিল ঠিক তেমনি এই আন্দোলনকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। সেই জন্য এই আন্দোলনের কিছু ক্ষতি ও হয়েছিল। জনগনকে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ দেয়নি। তাই **১৯৬১** সালে রাজ্য সমবায় মন্ত্রিদের সম্মেলনে নেহেরু বলেন যে,-"সরকারি নিয়ন্ত্রনের থেকে আর কিছু বেশি ক্ষতিকর হতে পারে না। যা মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন"।[47] ইত্যাদি কারনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

এই পর্যায়ে সমবায়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে যাতে সমবায়গুলি গড়ে ওঠে তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সময় অনেকগুলি ফেডারেশান ও তৈরি হয়। **১৯৫৬** সালে 'ন্যাশনাল কো- অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট বোর্ড' তৈরি হয়। **১৯৫৭** সালে সারাভারত কোওপারেটিভ ইউনিয়ন (বর্তমানে ন্যাশনাল কোওপারেটিভ ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া)-র দায়িত্বে সদস্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচি তৈরি হয়।[48]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

সমবায়ের ইতিহাসে এই পরিকল্পনা এক নতুন ধারনার তৈরি করেছিল, সমবায়ের ব্যক্তি মালিকানা ও সরকারি মালিকানা মিলে। এই পরিকল্পনায় নতুন কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল যা হল, সমবায় ও ঋণ সরবরাহ, বিপনন ও প্রক্রিয়াকরন, ভোক্তা সমবায়, শিল্প সমবায় প্রভৃতি।

---

[47] First Five Year Plan, Planning Commission, Govt. of India, p. 41

[48] Memoria, Dr C B and Shaksena, Dr R D, Cooperation in India, 5th Ed.,1977, p.202

এই কর্মসূচীগুলি তৎকালীন সমবায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তবু ও আমরা দেখি যে, এই সময় সমবায়ের আশানুরূপ আগ্রগতি ঘটেনি। কারন হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৩ সালে এন, সি, ডি, সি তৈরি হয়। এছাড়াও সরকারি নিয়ন্ত্রনের আধিক্যের ফলে বেসরকারি সংগঠনগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। সরকারি নীতি ও প্রয়োগের মধ্যে ও আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

এই পরিকল্পনা সমবায় ক্ষেত্রকে অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত করার জন্য অর্থ, সংগঠন, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি দিয়ে উপযুক্ত করে তোলার কথা বলা হয়েছিল।[49] দুর্বল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, ও ব্যাঙ্কগুলির বকেয়া ঋণের পরিমান কমিয়ে আনার সিধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সময় কৃষিতে ঋণদানের ক্ষেত্র যাতে বিস্তারলাভ করে তার জন্য বিভিন্ন এজেন্সি চালু করার কথা ও বলা হয়েছিল। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণের অগ্রগতি হলেও, দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের বৃদ্ধি তেমন হয়নি বললেই চলে। সমবায়ের সরকারি অংশগ্রহণের ফলে সমবায় সরকারি এজেন্সি থেকে সরকারি সংগঠনে পরিনত হয়েছিল। সমবায় জনগনের ক্ষমতা কমে সরকারের ক্ষমতা বেড়ে গেল। সমবায় বিশেষত ডঃ আর, সি দ্বিবেদী বলেন যে,- "চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হচ্ছে শেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। যেখানে সমবায়ের ওপর একটি সমগ্র অধ্যায় ছিল। এর সঙ্গেই সমবায় উন্নয়নের স্বর্ণ যুগের অবসান ঘটল। এরপর সমবায় পিছিয়ে জেতে লাগল এবং পরবর্তী পরিকল্পনা গুলিতে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল"।

---

[49] Draft Five Year Plan (1978-83), Planning Commision, Govt. of India, New Delhi, pp. 151-52

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

এই পরিকল্পনায় সমবায় সম্পর্কে তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বা তেমন কোনো উন্নয়ন ও ঘটেনি। এই সময় শুধু প্রাথমিক সমবায়গুলির রুপান্তর ঘটান আর ভূমি বন্ধক ব্যাঙ্ক গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল-১৯৭২ সালে ৪২টি কর্মপরিকল্পনা সহ সমবায় নীতি গ্রহন। এটাই ভারতের প্রথম সমবায় নীতি।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

সমবায় নিয়ে আলাদা কোন অধ্যায় রাখা হয়নি এই পরিকল্পনায়। আগের পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রাগুলিকে পুরন করা হয়েছিল। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৮২ সালে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (নাবার্ড) এর প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে সমবায় ও কৃষি সমবায় আন্দোলন ও মাইক্রো ক্রেডিট আন্দোলনে নাবার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

এই সময় পৃথিবীতে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাকে আমরা নয়া অর্থনীতিরযুগ বলে ও মনে করি। এতদিন সমবায়ের যা ক্ষতি হয়েছে সেগুলিকে গনতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা পুনর্গঠনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই সময় ব্রহ্ম প্রকাশ চৌধুরীর নেতৃত্বে ‘Model Cooperative Societies Act’ এর মাধ্যমে সমবায় গুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয় সমবায় বিধি তৈরি করে দিয়েছিল। এই সময় নাবার্ড কৃষিতে ক্রেডিট ও দরিদ্র মানুষকে ঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে স্বয়ম্বর দল গঠনের জন্য বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্ক গুলির সাথে একযোগে কাজ করার কথা বলা হয়। তার ফলে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলিকে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক সুদুর প্রসারী প্রভাব

পড়েছিল। সমাজের দরিদ্র মানুষগুলির কাছে মুক্তবাজার অর্থনীতি দরজা খুলে যায়। সামাজিক এই দরিদ্র মানুষগুলো বিশেষত মহিলারা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

এবার আমরা দেখি যে, এই পরিকল্পনায় সমবায়কে বাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে সমবায়ের পরিকাঠামর উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে প্রতিযোগিতা সক্ষম সমবায় গঠনের কথা বলা হয়। সমবায়গুলি জাতীয় সমবায়নীতি গ্রহনের মাধ্যমে তৃনমূল স্তরের সংগঠনকে শক্ত করা হয়। আবার এই পরিকল্পনায় জাতীয় আগ্রাধিকার ভিত্তিক ও দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়। এই সময় ভারত সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অর্থাৎ খোলাবাজার অর্থনীতি চালু করে। সকারের এই নীতি সমবায়ের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ফলে সমবায়কেও বাজারি অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় নামতে হয়।

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

এখানে আবার নয়া অর্থনীতির প্রভাবে সমবায় আন্দোলনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বিস্তারলাভ করতে থাকে। কৃষি, শিল্প, বাঙ্কিং, থেকে শুরু করে কর্মচারী, ছাত্র, শ্রমিক, যুব, মহিলা, সর্বস্তরে সমবায় প্রবেশ করেছিল। এই সময় সমবায় বিনিয়ন্ত্রনের জন্য 'মাল্টি স্টেট কোওপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট', ২০০২ চালু করা হয়েছিল আবার 'দ্য কোম্পানিজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' ,২০০২ লাগু করা হয়।[50] এই আইন গুলি পুরনো আইন গুলির ওপর আঘাত হানে।

---

[50] Ninth Five Year Plan, Planning Commision, Govt. of India, pp. 445- 462

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ-

দশম ও একাদশ পরিকল্পনায় সমবায় নিয়ে তেমন কিছু বলা হয়নি। এখানে তাঁত শিল্পকে সূর্য অস্তাচলের শিল্প বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারন যেহেতু বাজার ক্রমশ সংকুচিত হওয়ার কারনে তাঁত শ্রমিকরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধ্য হচ্ছে আত্ম হননের পথ বেছে নিতে। বৈদ্যনাথ কমিটি গঠন করে সমবায়ের পুনরুজ্জীবনের কথা বলা হলেও । এটি এখনও রুপায়নের পর্যায়ে।

অতএব ভারতবর্ষসহ পৃথিবীতে সমবায় সদস্যের সংখ্যা হল ১০০ কোটি। জাতি সঙ্ঘের পরিসংখ্যান বলে যে ৩০০ কোটি মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে সমবায়। সারাবিশ্বে এখন অনেক বেসরকারি কর্পোরেট হাউসের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে সমবায়। ভারতের সমবায়ী অর্থনীতি এখন স্পেনের সমবায়ের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমবায় উদ্যোগগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করছে। দেশীয় পুঁজির অবাধ প্রবেশের ফলে অর্থনীতি বিকাশ দ্রুত হয়। বড় বড় সমবায়গুলি এর সুযোগ গ্রহনকরে অভুতপূর্ব উন্নয়ন ঘটায়। এই প্রেক্ষিতে বিশ্বের অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সমবায়গুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে সম্পদ জোগাড় করে। সমবায় মডেল বাণিজ্যিকভাবে দক্ষ, জনগনের সময়োপযোগী নানারকম প্রয়োজনগুলি মেটাবার ক্ষমতা রাখে। সমবায় বর্তমানে ছোট বড় সবাইকে নিয়ে একত্রে লক্ষ্য লক্ষ্য কাজের সৃষ্টি করছে। সমবায় ব্যক্তির উন্নতি ঘটায়, আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, সামাজিক পুঁজি সৃষ্টি করে। সমবায় প্রতিষ্ঠনগুলি দীর্ঘকালীন নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে ও তারা দীর্ঘদিন টিকে থাকার ক্ষমতা সম্পন্ন, ধারাবাহিক, স্থিতিশীল ও সফল। সমবায় ব্যবস্থা আগের চেয়ে শক্তিশালী। তবে আগামি কয়েক বছরের জন্য যদি ধারাবাহিক কার্যক্রম না থাকে তাহলে এই ঐতিহাসিক সুযোগ নষ্ট হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১) অসীম রায়, ‘সমবায়’ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, কলকাতা, ২০০১ ,জুলাই, পৃ-

২) মধুছন্দা ভট্টাচায্য, ‘ভাণ্ডার’ অর্থনৈতিক সমবায়ে স্বামী বিবেকানন্দ,২০১৯, জানুয়ারি, পৃ-৩৫

৩) প্রবীর কুমার সামান্ত, ‘ভাণ্ডার’,স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয় সাধনে সমবায়, ২০১৯,জানুয়ারি, পৃ-৩৭

৪) ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাণ্ডার, সমবায়ের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ,২০১৯, জানুয়ারি, পৃ-২৫

৫) ডঃ অসীম করমকার,ভান্ডার, মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও সমবায়,২০১৯,জানুয়ারি,পৃ-২৭

৬) প্রদীপ কুমার পাঁজা, ভাণ্ডার, সমবায় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সুভাষ চন্দ্র বসু,২০১৯, জানুয়ারি,পৃ-৪৩

৭) রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাণ্ডার, প্রজাতন্ত্র দিবস ও সমবায় ভাবনা,২০১৯, জানুয়ারি, পৃ-৪৭

৮) অখিলেশ সুর,ভান্ডার,প্রজাতন্ত্র ও সমবায়,২০১৯, জানুয়ারি, পৃ-৩৩

৯) মঞ্জুলা বসু, সমাজ অর্থনীতি ও রবীন্দ্রনাথ, টেগোর রিসাচ ইনস্টিটিউট,২০১৭, পৃ-১৫

১০) তদেব

১১) The Gazette of India, March 26, 1904, Part-IV, pp. 23-24

১২) The Cooperative Societies Act, 1904, Section 3(2)

১৩) বন্দ্যোপাধ্যায় অশোক, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশ্ন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস বাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা, পৃ,১০৭

১৪) তদেব,

১৫) সমবায়মন্ত্রক, সহকারি সমাজ, ১৯৬২, পৃ- ১৬

১৬) Dwividi, Dr. R C, Hundred Years of Cooperative Movement in India, Vol. I, pp. 393-99

১৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমবায় নীতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ-৪০-৪১

১৮) irst Five Year Plan, Planning Commission, Govt. of India, p. 41

১৯) Memoria, Dr C B and Shaksena, Dr R D, Cooperation in India, 5th Ed.,1977, p.202 Taylor, C C Objectives of Farmer Co-operatives by a Sociological American Co-operation, 1949, pp. 63-73

২০) Mamoria, Dr. C B and Shaksena, Dr. R D, Cooperation in India, p. 120

২১) বন্দ্যোপাধ্যায় অশোক, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশ্ন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস বাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা, পৃ-৬৪,

২২) ibid

২৩) Mamoria, Dr. C B and Shaksena, Dr. R D, Cooperation in India, pp.180-81

২৪) Majumdar,Ramesh Chandra. Corporate Life in Ancient India. pp,27

২৫) Mukherjee, Radha Kumud. Local Govt.in Ancient India.pp.45

২৬) বন্দ্যোপাধ্যায় অশোক, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশ্ন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস বাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬[1] অসীম রায়, ২০০১ ,জুলাই,

২৭) তদেব

২৮) মার্কস, ১৮৬৪, পৃ.১১, ও মার্কস- এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্ক,পৃ, ১৪-১৫।, কলকাতা, পৃ-11

২৯) ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাণ্ডার, সমবায়ের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ,২০১৯, জানুয়ারি, পৃ-২৫

৩০) Ibdi.

৩১) প্রবীর কুমার সামন্ত, ভাণ্ডার,সমবায়ী মননে ভগিনী নিবেদিতা, ২০১৭, অক্তবর,পৃ- ১৯

৩২) রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাণ্ডার, প্রজাতন্ত্র দিবস ও সমবায় ভাবনা,২০১৯, জানুয়ারি, পৃ-৪৭

৩৩) ibdi

৩৪) বন্দ্যোপাধ্যায় অশোক, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশ্ন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস বাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা, পৃ-

৩৫) Ray P C, Essay and Discourses C H, Government and Indian Industries, p. 240

৩৬) মঞ্জুলা বসু, সমাজ অর্থনীতি ও রবীন্দ্রনাথ, টেগোর রিসাচ ইনস্টিটিউট,২০১৭, পৃ-১৫।

৩৭) Michael P. Todaro, **'Economic Development in the Third World',** Pearson Education Limited,1989,

৩৮) Speeches of Jawaharlal Nehru, 3rd vol., Information and Publication Ministry, Govt. of India, p.-8

৩৯) ibid

৪০) সমবায়ের ইতিহাস, পঞ্চায়েতী রাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র, কলকাতা,প্রথম সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ, জানুয়ারি ২০১৪

৪১) তদেব,

৪২) Bombay Banking Enquiry Committee Report, Vol. I, pp.86-87

৪৩) বন্দ্যোপাধ্যায় অশোক, সমবায় ও মানব সভ্যতা, ফেডারেশ্ন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস বাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড, ২০১৬, কলকাতা, পৃ,৯৪-৯৫

88) Draft Five Year Plan (1978-83), Planning Commision, Govt. of India, New Delhi, pp. 151-52

৪৫) Ninth Five Year Plan, Planning Commision, Govt. of India, pp. 445- 462

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিম মেদিনীপুর ও স্বনির্ভরগোষ্ঠী

এই অধ্যায়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মানুষের মধ্যে গোষ্ঠী সম্পর্কে ধারনা, স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা, এই গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা, ভারতবর্ষের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর পথ চলা। বাংলাদেশের গ্রামীণগোষ্ঠীর সাথে এই গোষ্ঠীর তুলনা, স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে যোগদানের ফলে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন, এবং স্বনির্ভরগোষ্ঠীর বাইরে থাকা মহিলাদের অবস্থা, সীমাবদ্ধতা। এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। উক্তবিষয়গুলির বিশ্লেষণ যেমনভাবে আমাদেরকে পরবর্তী অধ্যায়গুলির অনুধাবনে সহায়তা করবে, তেমনি স্বনির্ভরগোষ্ঠীভুক্ত ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর বাইরের মহিলাদের অবস্থানটাও স্পষ্ট করবে।

‘গোষ্ঠী’ শব্দটি মানুষের কাছে খুবই প্রাচীন আমরা জানি যে, আদিম মানুষ খাদ্যসংগ্রাহক পর্যায় থেকেই তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবন যাপন করত। পরবর্তী সময়ে এই গোষ্ঠীর ক্ষেত্র বিস্তারলাভ করেছে। যেমন- রক্ত সম্পর্কিত, পেশাগত, জাতিগত, ধর্মীয় প্রভৃতি। অনেকরকম গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিতকরে আবার গ্রামের উদয় হয়। এবং আমরা দেখি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের চিত্র। এতো গেল গ্রাম্যজীবনের মানুষের গোষ্ঠীর চিত্র। শহুরে মানুষের গোষ্ঠী বা দল বাঁধতে দেখা যায় পরিবেশ সুরক্ষা, খেলাধুলা, মাদকদ্রব প্রভৃতি ক্ষেত্রে। অতএব মানুষের গোষ্ঠীতে বসবাস করা বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবন যাপনের রীতি নতুন নয়। এর শিকড় অনেক গভীরে। G.A Almond এবং G.B Powell, Jr. তাঁদের Comparative Politics: A

Development Approach(1966)[51] গ্রন্থে তিনি গোষ্ঠীর ব্যাখ্যায় গোষ্ঠী গঠনের তিন রকমের প্রকারভেদের কথা বলেছেন-

১) স্বার্থ গোষ্ঠী(Interest Group)

২) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী(Pressure Group)

৩ প্রাথমিক গোষ্ঠী(Primary Group)

মানব জীবনে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সম্পদের সঠিক ব্যবহার, কর্মদক্ষতা, আত্মশক্তির বিকাশ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা, ব্যঙ্কের মাধ্যমে ঋণ পাওয়া থেকে শুরু করে সরকারি সাহায্য পাওয়া, সবেতেই গোষ্ঠীর ভূমিকা যথেষ্ট। আবার এই গোষ্ঠীর মাধ্যমে যখন মানুষ নিজের এবং সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে সেই গোষ্ঠীগুলিকেই বলা হয় স্বনির্ভরগোষ্ঠী।

কাকে স্বনির্ভরগোষ্ঠী বলব বা তার সংজ্ঞা কি হবে, তা নিয়ে পণ্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে গবেষকরা কিছুটা ক্ষেত্রে একই ধারনা পেশ করেছেন, তা আমি নিম্নে আলোচনা করলাম-

অর্থনৈতিকভাবে সমাজের প্রান্তিকস্তরে থাকা কিছু মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে জীবন ও জীবিকার স্বার্থে যখন কোন উদ্যোগ গ্রহন করে তখন তাকে স্বনির্ভরগোষ্ঠী বা (Self-Help Group) বলে।

---

[51] Almond, Gabriel A. and Powell Jr., G. Bingham.(1966). Comparative Politics: A Developmental Approach, Little, Brown and Company, Boston, pp. 74-76

স্বনির্ভরগোষ্ঠী ভারতবর্ষে নতুন হলেও এর শিকড় কিন্তু প্রাক-ব্রিটিশ গ্রামসমাজের 'ধর্মগোলার' মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল।[52]

Alka Srivastava তাঁর Self Help Groups and Civil Society: A Preliminary Study(2005) গ্রন্থে স্বনির্ভরের সংজ্ঞায় বলেন যে, "Self Help Group is a socially and economically homogenous group of 10-20 poor people voluntarily coming to gether to acieve common goals"।[53]

Dr. Amir Afaque Ahmad Faizi তাঁর Self-Help Groups and Marginalised communities(2005) গ্রন্থে বলেছেন যে, 'Self Help Groups are voluntary, small group structures for mutual aid and the accomplishment of a special purpose'[54] এর সাথে তিনি আবার বলেন, স্বনির্ভরগোষ্ঠী সাধারনত পরিচিত প্রতিবেশীদের যৌথ উদ্যোগে সমস্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হল বেঁচে থাকার প্রতিবন্ধকতা সমুহকে অতিক্রম করে উন্নত সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিবর্তন আনয়ন করা।

নাবার্ডা (National Bank for Agriculture and Rural Devlopment-NABARD) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'Self- Help Group is a small, economically homogeneous and affinity group of rural poor, voluntarily formed, to save and mutually agree to contribute to a common fund, to be lent to its members as per group decision for their socio-economic devlopment'[55]

---

[52] সিংহ, স্বপন (২০০১), স্বয়ম্বর গোষ্ঠী গঠনের ম্যানুয়েল, প্রতিবন্ধী সংঘ, কোলকাতা, পৃ ৫০

[53] Srivastava, Alka.(2005). Self Help Groups and Civil Society: A Preliminary Study, Indian Social Institute, New Delhi, Reprint, p 2

[54] Faizi, Dr, Amir Afaque Ahmad. (2009). Self Help Groups and Marginalized Communities, Concept Publishing Company, New Delhi, p. 32

CASHE- Credit and Savings for Household Enterprise স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে, 'পাশাপাশি বসবাসকারী সমমনভাবাপন্ন ও সমঅর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ৫-২০ জন দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ যখন স্বেচ্ছায় সঞ্চয় ও লেনদেনের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়, তখন সেই দলকে স্বনির্ভরদল বলে'।

এস, এইচ, জি ও মাইক্রফিনান্স প্রমোশনাল ফোরাম তাঁদের 'স্বনির্ভরদলের মুল্যায়ন ও মান নির্নয়'(২০০৫) গ্রন্থের ভুমিকায় স্বনির্ভরদলের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, যেকোনো ১৫-২০ জনের দলকেই স্বনির্ভরদল বলা যাবে না। যখন সেই দল স্বনির্ভরগোষ্ঠীর নিয়মাবলীগুলি মেনে চলবে। অর্থাৎ নিয়মিত মিটিং করা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর দলের নেতা ও নেতৃী বদল, প্রভৃতি বিষয়গুলি।[56]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি মন্ত্রক-এর দেওয়া সংজ্ঞাটি হল- SHG is a commitment made by 10- 20 persons belonging to different families living below poverty line. To work in unison as a group. The main objective behind the formation of the group is to attain self-sufficiency in financial matters through micro-saving"

---

[55] Mondal, Sagar and Ray, G.L.(2007). Textbook of Rural Development, Kalyani Publishers, Kolkata p 131

[56] স্বনির্ভর দলের মুল্যায়ন ও মান নির্ণয়, এস এইচ জি ও মাইক্রোফিনান্স প্রমোশনাল ফোরাম, সহযোগিতায়ঃ ক্যাশ প্রকল্প,(২০০৫), কেয়ার পশ্চিমবঙ্গ, কোলকাতা, পৃ ৩

স্বনির্ভরতায় গ্রামীণ শক্তির নতুন অভ্যুদয়- স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (২০০৪) এখনে এই দপ্তর স্বনির্ভর সম্পর্কে বলে যে, গ্রামের দরিদ্র মানুষ যখন ছোট ছোট দল গঠন করে নিজেদের অবস্থা ফেরানোর উদ্যোগ নেয় তখন তাদের বলে স্বনির্ভর দল। আবার স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে যখন তারা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উদ্যোগ নেবে, ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের খাতা খুলবে তখন তাকে বলা হয় স্বনির্ভরসঞ্চয় দল।

এগুলি থেকে এটাই বোঝা যায় যে, সমঅবস্থা, সমমনোভাব, সমস্বার্থবিশিষ্ট ৫-২০ জন একই সাথে বসবাস কারী দরিদ্র মানুষ যখন একসাথে যৌথ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে পারস্পারিক সঞ্চয় অ-লেনদেনের মাধ্যমে নিজের ও সমাজের উন্নততর পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে তখন তাকে স্বনির্ভরগোষ্ঠী বলে।

প্রায় দুইশত বছর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। খরা, দুর্বিক্ষ, মহামারি, অনবরত লেগেই থাকত। বহুসংখ্যক ভারতের মানুষ দু’বেলা দু’মুঠো খেতে পেত না। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা কিছুটা সুরাহা করলেও পরবর্তী পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধীর সময় ও তিনি গরিবি হঠাও স্লোগানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে গরীব মানুষদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি ঘটানোর জন্য নানান পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। অবশেষে ১৯৯০ সালে যখন সমগ্র পৃথিবীর মুক্তবাণিজ্য অর্থনীতির জোয়ার ভারতবর্ষের বুকে আছড়ে পড়ে তখন থেকে আর্থিকক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। আর সেই সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সাথে ভারতবর্ষে ও আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন হয় তার মধ্যে এক অন্যতম হল ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাবার্ডের পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে SHG-Banking Linkage

Programe চালু করে।[57] পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এর সহায়তায় ১৯৯২ সালে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর থানার 'খাঁড়ি লর্জ সাইজড় সমবায়ের' মাধ্যমে রাজ্যে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গড়ে তোলে। এন, জি, ও যেখানে স্বয়ম্বর বা স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান।

পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্বনির্ভরগোষ্ঠীর গঠনের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষরা একসাথে উন্নয়নের মাধ্যমে নিজের জীবনে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। বর্তমান রাজ্যের মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। কিন্তু এখন আমরা দেখে নেব সত্যিকারে কি স্বনির্ভরগোষ্ঠী গ্রামীণ উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা আছে ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ক্ষেত্রে। আর যদি ও থেকে থাকে তা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে তাও আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো। World Human Devlopment Report-2011 এর ভিতিত্তে লিঙ্গবৈষম্য, অসাম্য, দারিদ্রতা ইত্যাদির দিক থেকে ভারতবর্ষের স্থান কিন্তু ১৩৪ তম। সমগ্র ভারতবর্ষের অতিদারিদ্র জনসংখ্যার হার ২৮,৬%।[58] অতএব ভারতের স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও কিন্তু বহুমানুষ দারিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই ব্যর্থতা শুধু যে রাষ্ট্রের তা কিন্তু পুরোপুরি নয়, কিছুটা ব্যর্থতা মানুষের নিজেদেরও। কারন তারা কখনও কখনও নিজেরা যৌথভাবে বা গোষ্ঠীগঠনের মাধ্যমে নিজেদের নিজেদের সমস্যাগুলিকে সমাধান করে উন্নয়নের কথা ভাবেনি। বিগত কয়েক দশক ধরে ভারতের সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক এই অদৃশ্য পরিবার গুলিকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পাখির চোখ করেছে। ফলে সাধারন দরিদ্র মানুষগুলি মহাজনী শোষণের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাচ্ছে। সাধারন মানুষের দৈনন্দিন ভোগ্যপন্যের চাহিদার প্রয়োজনে সহজ শর্তে তারা স্বল্প সময় ও সুদে তারা ঋণ পেতে চায়। এখন প্রশ্ন হতেপারে এর

---

[57] Basu, K and Jindal, K , Microfinance EmErging Challenges, pp 9, 114

[58] World Human Development Report-2011, Unitede Nations Development Programme, New York, pp 126- 144

জন্য গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষত চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এবং বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট ও সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কাজ করলে সফলতা হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি। তাই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসহ পৃথিবীর ৬০টির ও বেশি দেশে এই স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলারা অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়েছে।[59] মুহাম্মদ ইউনূস তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন যে, “পুরুষের তুলনায় মহিলারা ঋণের প্রয়োগ করে অনেক দ্রুত আশাতীত পরিবর্তন আনতে পারেন”। অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সামর্থ্য, সক্ষমতা অর্জন , ক্ষমতায়ন, দারিদ্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে নারীরা আজকে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনকে হাতিয়ার করেছে। তাই আবার গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে ৫০% মহিলা গ্রহীতার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি এস, জি এস, আয় প্রকল্পেও ব্লক ভিত্তিক দলের ক্ষেত্রে ৫০% এবং মোঠ স্বরোজগারির ৪০% মহিলা আবশ্যিক করনের কথা বলা হয়েছে।

স্বনির্ভরগোষ্ঠী গ্রামীণ উপেক্ষিত বঞ্চিত পিছিয়েপড়া দরিদ্র মহিলাদের কাছে এক নতুন আলো নিয়ে এসেছে, তাদের নিজেদের মধ্যেকার পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য নতুন নতুন চিন্তা, আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের সঞ্চয় থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ নেওয়া, নিজেদের বিপদে অন্যের সাহায্য, রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন, গ্রামীণ প্রকল্পগুলি সম্পর্কে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান, বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সবশেষে আত্মনির্ভরতা তৈরি প্রভৃতি নানান দিক আছে যার জন্য কিন্তু বর্তমান দরিদ্র গ্রামীণসমাজে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা আছে যথেষ্ট।

---

[59] বিশ্বাস বিপুল কৃষ্ণ (সম্পা,) (২০০০), আদর্শ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ার জাদুকাঠি, প্রতিবন্ধী সংঘ, কোলকাতা, পৃ ৫১

"ক্ষুদ্রঋণ" হল এমন একটি প্রভাবশালী ও কার্যকারী শক্তি যা ব্যবহার করে দরিদ্র মানুষ তার প্রচেষ্টা ও দক্ষতার সাহায্যে নিজেদের প্রাথমিক প্রয়োজন পুরনে নিজেরাই সুস্থায়ী ভাবে সক্ষম হয়ে উঠবেন"।[60]

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূসের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম এর জবরা গ্রামের ৪২টি পরিবারকে ৮৫৬ টাকা ঋণ দিয়ে যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সূচনা করেছিলেন তা পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মানুষের কাছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিকের উন্মেষ ঘটায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারাবিশ্বের কাছে জনপ্রিয় করে তুলে ২০০৬সালের ১৩ ই অক্টোবর নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। তবে ভারতবর্ষের স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের গ্রামীণ গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে এই পার্থক্যগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ-

গ্রামীণগোষ্ঠী ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর গঠনগত ও কার্যগত ভূমিকার পার্থক্য সমূহঃ-

ভারতবর্ষের স্বনির্ভরগোষ্ঠী	বাংলাদেশের গ্রামীণগোষ্ঠী
১। সাধারনভাবে গোষ্ঠীর সদস্যরা মহিলা হন। এক একটি গোষ্ঠী গঠিত হয় ৫-২০ জন সদস্য নিয়ে।	১।সাধারনভাবে সদস্যরা মহিলা হন। এক একটি গোষ্ঠীতে সদস্য থাকেন অনধিক ৫ জন।
২। গোষ্ঠী গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে অসরকারি সংগঠন, ক্ষুদ্র পুঁজি সংস্থা, ব্যাঙ্ক বা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সরকার।	২। গোষ্ঠী গঠন করে থাকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীরা। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সবচেয়ে নিচের স্তর হল 'centre'। এক একটি সেন্টারের আওতায় ৫-৭ টি গোষ্ঠী থাকে।

---

[60] ইউনূস, মুহাম্মদ,(২০০৬) গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন, অনুবাদ ইলা লাহিড়ী ও জয়ন্ত লাহিড়ী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পৃ ৮২

৩। সাধারন গোষ্ঠীসভা বসে মাসিক ভিতিত্তে। সাধারনত গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেরাই সভা পরিচালনা করে। সদস্যরা নিজেরাই ঠিক করেন সঞ্চয়ের পরিমান। এছাড়া ঋণের পরিমান ও প্রদান পদ্ধতি ও ঠিক করেন। নেতা ও নেত্রি নির্বাচন করেন।	৩। গোষ্ঠীসভা অনুষ্ঠিত হয় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীরা সভায় উপস্থিত থেকে সভা পরিচালনা করেন।
৪। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের সুবিধা বা নিজেদের সঞ্চিত অর্থের সুরক্ষা বা সুদ পাওয়ার জন্য গোষ্ঠীর নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।	৪। প্রত্যেক সদস্যার আলাদা আলাদা নিয়মিত নির্দিষ্ট এবং আবশ্যিক সঞ্চয় ও ঋণ অ্যাকাউন্ট থাকে। এটি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রপুঁজি সংস্থার সাথে যুক্ত।
৫। ক্ষুদ্রপুঁজি সংস্থা, অসরকারি সংগঠন, ব্যাঙ্ক বা সরকারি প্রকল্পের সম্পদ কর্মীদের কাজ হল গোষ্ঠীগুলি যাতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে তার পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করে।	৫। গোষ্ঠী সংগঠিত করা এবং গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল।
৬। ক্ষুদ্রপুঁজি সংস্থা বা ব্যাঙ্ক এখানে গোষ্ঠীরসঙ্গে লেনদেন করে থাকে, কোন সদস্যার সাথে নয়।	৬। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে সরাসরি সদস্যদের সঙ্গে লেনদেন করে।
৭। ব্যক্তিগত গোষ্ঠী ঋণের অর্থ ব্যায়ের উপরে গোষ্ঠীর তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।	৭। সদস্যার গৃহীত ঋণের ব্যবহারের উপর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চুক্তি ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ থাকে।

৮।ঋণ প্রাপ্তির জন্য জামানতের প্রয়োজন হয় না। যৌথদায়বদ্ধতার ভিত্তিতে প্রয়োজনের নিরিখে ঋণ প্রদান করা হয়।	৮। জামানত ছাড়া একক ও যৌথ দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়। একজনের ঋণশোধ না হলে অন্য জন ঋণ পাবে না। তবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গরিবের ঋণ পাওয়ার অধিকারকে মানবিক অধিকারের মতোই প্রাপ্য বলে মনে করেন।
৯। গোষ্ঠীগত সঞ্চয় জমা মাসিক কিস্তিতে ২০-১০০ টাকা।	৯। গোষ্ঠীগত সঞ্চয় জমা সাপ্তাহিক ৫- ২৫ টাকা।
১০। গোষ্ঠী তহবিল থেকে নেওয়া ঋণে সুদের হার সাধারনত ২৪% পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর স্বহায়ক প্রকল্পের(১-৪-২০০৯) মাধ্যমে ব্যাঙ্ক কতৃক প্রকল্প ভিত্তিক SGSY SJSRY গোষ্ঠী ঋণের সুদেরহার যা হবে তার ৪% দেবে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলি, বাকি অর্থ দেবে রাজ্য সরকার।	১০। সুদেরহার চার ধরনের- আয় বর্ধনকারী ঋণে ২০% রন নিয়ে এক বছরে পরিশোধ করে দিলে গৃহঋণ ৮% এবং সদস্যাদের সন্তানে উচ্চ শিক্ষাঋণ ৫%
১১। সদস্যদের শিক্ষা এবং উদ্যোগে প্রয়োজন।	১১। সদস্যদের উদ্যোগে কিংবা শিক্ষার তেমন কোন প্রয়োজন নেই।
১২। গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপে নমনীয়তা বেশি।	১২।গস্থি গঠনে সদস্যদের স্বাধীনতায় সুদেরহার নির্ধারণসহ নানা বিষয়ে নমনীয়তার অভাভ দেখা যায়।

উৎস- Harper, Malcolm.(2003). Practical Micro-Finance: A Training Guide for South- Asia, Vistaar Publication, New Delhi, pp.109-111 & Yunus, Muhammad.(2011). Grameen Bank at a Glance, October.

স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতবর্ষে নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, আর্থসামাজিক অনগ্রসরতা প্রভৃতি কারনে সমাজের এক বৃহত্তর অংশ এই উন্নয়নের মূলস্রোতে সামিল হতে পারেনি। এই বৃহত্তর অংশের একটা বিশেষ অংশ হল নারী। প্রাচীনযুগে নারীরা যে শুধু পুরুষের সহযোগী হিসাবে সমাজে বসবাস করছে তা নয় তারা বিদ্যাচর্চা ও অস্ত্রচালাতে ও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে মধ্যযুগে বিভিন্ন টোল ও মক্তবের মাধ্যমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা বিদ্যাচর্চা করলেও তা কিন্তু উচবিত্ত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক যুগে প্রথম পর্যায়ে নারীদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১৯৬০ এর দশকে সারা পৃথিবীব্যাপী নারীমুক্তি আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছিল তার ফলে দেশের প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় দরিদ্র, পিছিয়েপড়া, অনগ্রসর নারীরা এগিয়ে এসেছিল অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আর সেই সময় প্রথাগত ব্যাঙ্কগুলিও মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে সহায়ককারীর ভূমিকা পালন করে। আর এই পিছিয়েপড়া একটা বিরাট অংশকে ১৯৯০ এর দশকে সমাজের উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করতে যে মাধ্যম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তা হল, ক্ষুদ্রপুঁজি, ক্ষুদ্রঋণ ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ধারনা। যা আমরা আমীর আফাক আহম্মেদ ফৈজী “Self-Help Groups and Marginalised Communities”(2009) গ্রন্থের মধ্যে পাই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দেখা যায় শ্রী মতি এলা ভাটের অনুপ্রেরনায় গুজরাতে কিছু শ্রমজীবী মহিলাদের দ্বারা গঠিত “ Self Employed Women’s Association(SEWA)(1972). পরে ১৯৭৪ সালে ব্যাঙ্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা হয়। এই ব্যাঙ্ক গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। পরে কর্ণাটকে আবার ১৫০০০ তিব্বতি রিফিউজিদের পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল “ Mysore Resettlement and Development Agency(MYRADA)(1968). ১৯৭৮ সালে এটা পুরপুরি ব্যাঙ্কের মর্যাদা পায়।

ভারতের দরিদ্র মানুষদের নিয়ে কাজ করে বৃহৎ পরিসরে। যেমন- অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু, প্রভৃতি রাজ্যের জেলাগুলিতে।[61] ১৯৮৯ সালে অধ্যাপক এ, এম, খুশরও-র নেতৃত্বে কৃষিঋণ কমিটি এবং ১৯৯১ সালের ২৪ সে জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সহায়তায় ১০-২৫ জনের দল গঠনের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে 'নাবার্ডা' নামে পাইলট প্রজেক্ট-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৯১-৯২ সালে এই প্রকল্প দক্ষিণ ভারতে ৫০০ টি স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনের মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু করলেও ১৯৯৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকাতে সমস্ত ব্যাঙ্কের কাছে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আবার ১৯৭০ সালে গঠিত "Rotating Savings and Credit Association(ROSCA). যা পরবর্তীকালে 'ক্রেডিট কোঅপারেটিভ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে ১ লা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কাজকে আরও প্রসারিত করার জন্য তৈরি হল সারকারি উদ্যোগে 'স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনা' নামে একটি প্রকল্প যাকে আগের দিনের ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের "ধর্মগোলার"[62] পরিপুরক বলে মনে করা হয়।

উপরিউক্ত প্রতিটি ব্যবস্থার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কিন্তু এক, সবাই কিন্তু যাতে সাধারন মানুষরা খুব সহজে ঋণ পেয়ে নিজেদের আর্থিক ভাবে সহায়তা পায় তার জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সারাবিশ্বে মাইক্রোফিনান্স বা দরিদ্রের জন্য ঋণ ধারনাটি ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইউনূসের হাত ধরেই তৈরী হলেও। পরবর্তীকালে দক্ষিণ এশিয়া ও যার মধ্যে

---

[61] Mysore resettlement and development agency (MYRADA)-1968

[62] ধর্মগোলা হল । ধান ওঠার সময় গ্রামের কিছু মানুষ একটি পাত্রে ধান জমা রাখেন, পরে অসময়ে প্রয়োজন মতো সেখান থেকে ধান নিয়ে প্রয়োজন মেটান। অতিরিক্ত ধানের বিনিময় এখান থেকে ধান ঋণ হিসাবে ও দেওয়া হয়। অতিরিক্ত আয় সদস্যাদের মধ্যে সমহারে বণ্টিত হয়। এই ধান জমা রাখার এই পাত্রটিকে গ্রামাঞ্চলে "ধানের গোলা" বলা হয় সেখান থেকেই ধর্মগোলা কথাটার উৎপত্তি।

ভারতবর্ষেও এই ধারনা বিকাশলাভ করেছে। ভারতে মাইক্রোফিনান্স ব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তারকারী বড় বড় মাইক্রোফিনান্স প্রতিষ্ঠানগুলি হলঃ-

1. Society for Helping Awakening Rural Poor through Education(SHARE).
2. Bharatiya Samrudhi Investments and Consulting Serviees(BASIX).
3. Self-Employed Women's Association(SEWA).
4. Mysore Resettlement and Devlopment Agency(MYRADA).
5. Professional Assistance for Devlopment Action(PRADAN).

ভারতবর্ষের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে মাইক্রোফিনান্স সর্বোচ্চ প্রসারলাভ করলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ তারমধ্যে অন্যতম। দক্ষিণের রাজ্যগুলির তুলনায় দেরিতে শুরু হলেও ২০০০ সালের পর এ রাজ্যে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা জোটবেঁধে দরিদ্র মোকাবিলায় নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে স্বনির্ভর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিচ্ছে।

বর্তমানে স্বনির্ভরগোষ্ঠী শুধু উৎপাদন ভিত্তিক নয়। প্রক্রিয়াজাত ও বিক্রয়জাত শিল্পের সাথে ও যুক্তহচ্ছে। আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠগুলিও প্রধান মন্ত্রীস্বরোজগার

যোজনা ও বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আত্মসম্মান ও মর্যাদার সহিত আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিজেদেরকে সামিল করেছে। পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে NABARD ও SGSY প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্যকে তুলনামুলক ভাবে আলোচনা করব।

NABARD	SGSY
এই গোষ্ঠী শুরু হয় ১৯৯২ সালে দক্ষিণ ভারতে।	এই গোষ্ঠী ভারতে শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ১ লা এপ্রিল।
এই গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা হবে ১০-২০ জন	এই গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা হবে ৫-২০ জন
গোষ্ঠীর নিবন্ধীকরন বাধ্যতামূলক নয়	এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর নিবন্ধীকরন বাধ্যতামূলক
একটি পরিবার থেকে একজন সদস্য হতে পারবে।	একটি পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দলের সদস্য হতে পারবেন। কিন্তু একটি দলে একই পরিবারের ২ জন বা একই ব্যক্তি একাধিক দলের সদস্য হতে পারবে না।
দরিদ্র মানুষদের নিয়ে দল গঠিত হবে।	এক্ষেত্রে প্রায় ৭০% সদস্য দরিদ্র সীমার নিচে থাকতে হবে।
এক্ষেত্রে সব সদস্য মহিলা নাও হতে পারেন।	এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০% দল মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয়।
এখানকার তহবিলের সবটাই NABARD দ্বারা পরিচালত।	এটাতে কেন্দ্র দেয় ৭৫% আর রাজ্য ২৫%। উত্তর- পূবাঞ্চলের রাজ্য গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র দেয় ৯০% আর রাজ্য দেয় ১০%।

এখানে নিয়মিত সাপ্তাহিক মিটিং করতে হয়।	এখানে সাপ্তাহিক, মাসিক ও পাক্ষিক মিটিং হতে দেখা যায়। মাসে অন্তত দুটি সভার ওপর জোর দেওয়া হয়।
এখানে ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্রপুঁজি সংস্থা(MFI)স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।	এখানে সরকার (DRDC ও গ্রাম পঞ্চায়েত) ব্যাঙ্ক স্বনির্ভরগোষ্ঠী সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।
এক্ষেত্রে সদস্যের আর্থসামাজিক অবস্থা দেখা হয়।	এক্ষেত্রে সদস্যের আর্থসামাজিক ও জাতিগত ব্যবস্থার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
৫০০ টি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর হাত ধরে এটা শুরু করেছিল।	৬ টি প্রকল্প (IRDP, DWCRA, TRYSEM, MWS, SITRA, GKY,) মিলিত রূপ।

স্বনির্ভরগোষ্ঠীর বিভিন্ন মডেলঃ-

এবার আমরা স্বনির্ভরগোষ্ঠীর প্রচলিত মডেল গুলি কি কি এবং তারা কোন কোন বিষয়ে অংশ গ্রহন করে, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবো। স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বনির্ভরতায় প্রথম প্রজেক্ট এর তিনটি মডেল বার করে। নাবার্ড পরবর্তীকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, নাবার্ডের মুখ্য কার্যালয়ে এক সভায় মিলিত হয়ে চতুর্থ মডেল হিসাবে সমবায়কে স্বীকৃতিদেয়।

১) এই মডেলটি self-help promoting institution গঠনের জন্য যাবতীয় কাজকর্ম ও সুপারিশ করে।

২) স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

৩) এক্ষেত্রে আবার ব্যাঙ্ক নিজে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনে ও উন্নয়নে অংশগ্রহন করে।

তবে অবশেষে চতুর্থ মডেলটি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠন থেকে শুরু করে, ঋণগ্রহন, প্রশিক্ষণ, নীতি নির্ধারণ সবই করে থাকে।

পরবর্তীকালে আরও দুটি নিজস্ব মডেল গঠিত আছে যারা নিজেরা সরাসরি ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি পরিচালনা করছে তারা হল।–

১) স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJSRY-১৯৯৭)

২) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা(SGSY-১৯৯৯)

৩) স্বয়ং সিদ্ধা, মহিলা সমৃদ্ধি।

৪) রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প।[63]

স্বনির্ভরগোষ্ঠীর গঠন ও কার্যকলাপঃ-

বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের দরিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কিন্তু দরিদ্র দূরীকরণের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০০৬ সালের স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি মন্ত্রক গঠনের মাধ্যমে। এই দপ্তর স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহনের জন্য ও সাহায্য করে। যেমন- সেলাই, পেকেজিং, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেসান, ইন্টিরয়র ডেকরেসান চর্মশিল্প দ্রব্য উৎপাদন ও বাজার জাত করন, মৌ-মাছি পালন, বই বাঁধাই, community health service, কাগজের ঠোঙ্গা তৈরি প্রভৃতি কর্মপদ্ধতির মধ্যেদিয়ে গ্রামীণ বেকার দরিদ্র মানুষের বেকার সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নতি ঘটায়। পশ্চিমবঙ্গের এই স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

---

[63] Sen Manab (2005) Study of Self Help Groups and Microfinance in West Bengal, SIPRD and dasgupta and co.pvt. ltd. Kolkata, p 33

মন্ত্রক সংস্থা প্রতি বছর রাজ্যে সবলা মেলা এবং নভেম্বর মাসে দিল্লিতে Indian International Trade Fair, এর আয়োজন করে থাকে।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের গ্রামের সাধারন মানুষের দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় গ্রামপঞ্চায়েত গুলিকে। আর এই গ্রামপঞ্চায়েত এর মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণের প্রধান ভুমিকা পালন করে গ্রামীণ স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি। এক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি দেখতে পাই। এক দল এ, পি, এল অন্য দল বি, পি, এল আবার গ্রাম পঞ্চায়েতে এই স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলির দেখভালের জন্য প্রশিক্ষিত দু'জন কর্মী থাকেন, তারা পুরো গোষ্ঠীর কাজকর্মের উপর নজর রাখেন। যেমন-

১) প্রতি ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় শনিবার স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলিকে পঞ্চায়েত আফিসে হাজির করানো।

২) গ্রামের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষ গুলিকে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনেও যোগদানের ব্যবস্থা করা।

৩) গোষ্ঠীর কাছাকাছি থাকা , সুবিধা আসুবিধা গুলিকে লক্ষ্য করা।

৪) ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ পেতে সাহায্য করা।

এই স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি বর্তমানে সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প থেকে শুরু করে মিড-ডে-মিল, হাসপাতালে খাবার পৌঁছানো প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট ভাবে কাজ করে চলেছে গ্রামীণ স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলি। ২০০৭ সালে UNICEF এর সহায়তায় দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের জন্য

‘Menstrual Hygiene Management’ এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী ও নেওয়া হয়।

গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি যেমন স্থানীয় মানুষের উদাসীনতা, পরিচিতিগত সমস্যা, স্বল্প বেতন প্রভৃতি বাধা গুলিকে কাটিয়ে উঠে গ্রামপঞ্চায়েতের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার ও উন্নয়ন মূলক কাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহন করছে।

স্বনির্ভরগোষ্ঠী দক্ষিণ ভারতের জেলা গুলিতে প্রথমে শুরু হলেও পুরপুরিভাবে মানুষের বুঝে উঠতে সময় লাগে ২০০১-২০০২ সাল। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মাত্র পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভরগোষ্ঠী হল ভারতের ১১%। গোষ্ঠীর গড় সঞ্চয় জাতীয় যে মাত্রা তা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে ২৭৮,৫৮ টাকা। তবে সমস্যা হল যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ব্যাঙ্ক সংযোগ ও ঋণপ্রাপ্তিতে জাতীয় মানের অর্ধেক।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা ভিত্তিক স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যাঃ-

S.NO	DISTRICT NAME	NEW	REVIVED	PRE-NRLM	SUB TOTAL	S C	S T	MINORITY	OTHERS	SUB TOTAL	PWD
1	24 PARGANAS	20802	2638	17694	41134	163773	26784	111641	110173	412371	16207

2	24 PARGANAS SOUTH	36304	2193	16743	55240	225299	10101	161480	205136	602016	3062
3	ALIPURUDUAR	8031	529	8592	17152	73160	42022	17243	45467	177892	3928
4	BANKURA	22860	1637	16114	40611	165692	47858	27952	186513	428015	3100
5	BIRBHUM	21630	5662	17060	44352	172282	29321	157397	90411	449411	1127
6	COOCHBEHAR	24403	1009	16154	41566	270113	2559	105693	65943	444308	720
7	DERJEELING GTA	2683	226	967	3876	2592	12570	2243	18768	36173	23
8	DINAJPUR DAKSHIN	7967	908	8991	17866	65570	26131	53804	43914	189419	1751
9	DINAJPUR UTTAR	13780	1499	8989	24268	87209	12630	106994	28608	235441	7248
10	HOOGHLY	18825	2146	18375	39346	154937	25338	39317	150485	370077	4107

11	HOWRAH	16642	730	10996	28368	73457	2630	45927	174671	296685	1102
12	JALPAIGURI	15874	1440	11267	28581	173605	43055	49628	32781	299069	453
13	JHARGRAM	6167	1452	5049	12668	29507	34059	3523	55209	122298	3488
14	MALDAH	27541	720	15590	43851	101670	21190	237223	97224	457307	1110
15	MURSHIDABAD	33256	8735	33045	75036	87257	7410	448248	135372	678305	27956
16	NADIA	20529	1426	17277	39232	129217	10383	88977	100317	328894	1419
17	PASCHIM BARDHAMAN	3876	358	2054	6288	30362	7115	5232	20311	63020	456
18	PASCHIM MEDINIPUR	15212	2822	17995	36029	92276	43571	32369	193009	361225	5311

19	PURBA BARDHAMAN	14085	2446	11208	27739	138992	25331	69454	47324	281101	5504
20	PURBA MEDINIPUR	29161	2802	28191	60154	96117	2271	52674	450835	601897	2552
21	PURULIA	14185	2847	16248	33280	68874	75601	14191	198873	357539	1241
22	SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD DMMU	4185	56	2298	6539	36765	13213	6513	12739	69230	157
	TOTAL	377998	44281	300897	723176	2438744	521143	1837723	2464083	7261693	920022

13 march 2019

Developed & hosted by National Informatics Centre, Content provided and maimtained by Ministry of Rural Development, Govt. of India.

এবারে আমরা আলোচনা করবো যে SGSY এর অধীনে কত শতাংশ গোষ্ঠী আছে বা কাজ করছে। আবার এর বাইরে কত শতাংশ গোষ্ঠী আছে বা কাজ করছে।

পশ্চিমবঙ্গের **SGSY** এবং **SGSY** এর বাইরের গোষ্ঠীগুলির সঞ্চয় ও ঋণ সংযোগের চিত্রঃ-

গোষ্ঠীর ধরন	সঞ্চয়	সংযোগ	ঋণ	সংযোগ
	স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যা (%)	অর্থের পরিমান (কোটিতে) (%)	স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যা (%)	অর্থের পরিমান (কোটিতে)
SGSY এর বাইরের গোষ্ঠী	594008(65.6)	890.87(79.4)	499467(66.6)	1874.62(64.0)
SGSY	311607(34.4)	231.12(20.6)	250015(33.4)	1055.90(36.0)
	905615(100)	1121.99(100)	749482(100)	2931.52(100)

111th State Level Bankers Committee (SLBC) Report, (2010). West Bengal

উপরিউক্ত সারনি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিশেষ করে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার অপেক্ষা বাইরের গোষ্ঠী গঠনের পরিমান অনেক বেশি। তাই ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঞ্চয় ও ঋণ সংযোগের পরিমান ও অনেক বেশি। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে মোট স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৫ লক্ষের ও বেশি। গড়ে দশ জন করে সদস্য ধরলে প্রায় দেড় কোটি সদস্য স্বনির্ভরগোষ্ঠীতে রয়েছেন। যার ৯০% মহিলা।

স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনের কাঠামোঃ-

স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার অন্তর্ভুক্ত এই স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলির মধ্যে ৭৫% অর্থ বহন করে কেন্দ্র, আর বাকি ২৫% বহন করে রাজ্য। চারটি স্তরে কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই কর্মসূচী সফল হয়ঃ-

১) কেন্দ্রীয় স্তরে সমন্বয় সাধন কারী কমিটি।

২) রাজ্য স্তরে SGSY কমিটি।

৩) জেলা স্তরের SGSY কমিটি।

৪) ব্লক স্তরের SGSY কমিটি।

সবার উপরে থাকবে State level Steering Committe পরবর্তী স্তরে থাকবে লোড়াল এজেন্সি হিসাবে প্রতিটি জেলাতে SGSY প্রকল্পের সার্বিক রুপায়নের দায়িত্বে থাকবে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন কোষ(District Rural Development Cell) এর পরে থাকবে জেলা স্তরে স্বনির্ভরগোষ্ঠী বা (District Level Society)তার পর থাকে ব্লক স্তরে মহাসংঘ, এবং পঞ্চায়েত স্তরে ৫০-৬০ টি স্বনির্ভরগোষ্ঠী নিয়ে সংঘ।

Steering Committee এর কাজ হল পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কার্যকলাপের মুল্যায়ন্, পরামর্শ প্রদান নিয়ন্ত্রণ, জেলা স্তরের সমিতি গুলির কাজ হল ব্লক স্তরের সমিতি গুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরামর্শ দান, কাজের মুল্যায়ন করা। গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের বিপনন ব্যবস্থা। স্কিমগুলিকে চিহ্নিত করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া। দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহন। ব্লক স্তরের গোষ্ঠীগুলির কাজ হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ছড়িয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলির একত্রিত করন সবচেয়ে সমাজের উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে একেবারে অন্তিম স্তরে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। তাদের কাজ হল গোষ্ঠীর সদস্যদের ঋণ এর ব্যবস্থা করে দেওয়া। ব্যাংক সহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলির সাথে পরিচয় করান।প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামস্বরোজগার যোজনার আওতায় গঠিত স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলি ছাড়াও ২০০৯ সালের পর থেকে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে তৈরী হল গ্রামীণ জিবিকা বিকাশ উদ্যোগ

এই মিশনের লক্ষ্যগুলি হলঃ-

১। গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলি স্বনিযুক্তি ও মজুরি ভিত্তিক নিয়মের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করা।

২। এই মিশনের সাফল্যের জন্য জাতীয় স্তর থেকে শুরু করে ব্লক স্তর পর্যন্ত দক্ষ ও পেশাদারি অধিকারিককে নিয়োগ করা হবে।

৩। সামাজিক একত্রিতকরন থাকবে, অর্থাৎ এই কর্মসূচিতে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা সমস্ত জাতপাতকে দূরে রেখে স্বনির্ভরতার জন্য একত্রিত হবে।

৪। স্বনির্ভরগোষ্ঠী এবং গ্রাম ও উচ্চতর কোন গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের মতামত জানানো এবং বহিরাগত সংস্থা গুলির ওপর তাদের নির্ভরশীলতা কমানোর ও জাতীয় মিশন কাজ করবে।

৫। তহবিল গঠনের মাধ্যমে যোগ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটাবে, আর যে সমস্ত গোষ্ঠীগুলি ঋণশোধ করতে পারছে না তাদের জন্য বিশেষ ভর্তুকির ও ব্যবস্থা করবে।

৬। জীবিকা মিশন প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের জীবিকা গ্রহনের পদ্ধতির মূল্যায়ন করবে।

৭। দরিদ্র মানুষের জন্য বিভিন্ন বিমার ব্যবস্থা করবে।[64] প্রভৃতি।

---

[64] Department of Pancayet and Rural Development, Goverment of West Bengal Directory of SHG আনন্দধারা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন সমিতি গঠনের কর্মসুচি শুরু হয় ২০১২ সালের মে মাসে যা বর্তমানে ‘আনন্দধারা প্রকল্প’ নামে রুপায়িত হয়েছে।

বর্তমানে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সমস্যাঃ-

মানুষ তার সমস্যা সমাধানের মধ্যেদিয়ে সারাজীবন অতিবাহিত করে। সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে। স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও প্রাথমিক পর্যায়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল তার লক্ষ্য পুরনের ক্ষেত্রে তাকে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আবার হচ্ছে ও। কিছু বাধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে আবার কিছু বাধা কিন্তু কাটিয়ে উটতে পারছে না। সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বিশেষত যখন বাধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না তখন কিন্তু দেখা যাছে যে গোষ্ঠীগুলি একেরপর এক ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর কারনগুলি হলঃ-

১) পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার আওতায় থাকার জন্য সব কিছু সরকারী সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে, আর বাইরের গোষ্ঠীগুলি কিন্তু সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে তাই এই উন্নয়নের কর্মযোগ্যে কিছুটা হলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২) প্রথমের দিকে NGO রা বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠন করে উন্নয়নে সামিল হত, এবং সরকারী সহায়তাও পেত কিন্তু SGSY, এর আওতায় আসার ফলে এই গোষ্ঠীগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।[65]

৩) গ্রামীণ পঞ্চয়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েত সদস্যের কর্তারা দলীয় রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে।

---

[65] প্রভাত দত্ত, (২০১২) পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও গরীব মেয়েরা, পঞ্চায়েতি রাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামনয়ন বিভাগের সমাচার পত্র, কলকাতা, পঞ্চম বর্স, পঞ্চম সংখ্যা মে পৃ ৬।

৪) অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে মূলত তৈরি হয় বি,পি,এল তালিকার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই তালিকা নিয়েও বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেকে আবার নাম না থাকা সত্তেও গোষ্ঠীতে যোগদান করে দেখা যাছে যে আবার অনেক ক্ষেত্রে সত্যি তারা বি,পি এল এর যোগ্য কিন্তু সরকারী খাতায় তাদের নাম না থাকার জন্য সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত।

৫) বর্তমানে সরকারী হস্তক্ষেপে বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যদ্রব বিক্রয়ের জন্য মেলার আয়োজন করলেও উত্তর আধুনিকতার যুগে বাস করে মানুষ এখন আর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশীয় জিনিস কেনার প্রতি কম আসক্তি হয়। আর সেই একই জিনিস যান্ত্রিকভাবে উৎপাদিত হওয়ার জন্য মুল্য ও অনেক কম হয়। প্রভৃতি কারনের জন্য এক এক করে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলি ভেঙ্গে যায়।

৬) স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যদের ক্ষেত্রে ও জাতপাত এবং সামাজিক শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদির সাথে বাধ্য বাধকতায় তাল মেলাতে না পারার কারনে দল থেকে বহু মানুষ ছিটকে বেরিয়ে যায়।

৭) সার্বিকভাবে সরকারী গাফিলতির কারনে অনেক গোষ্ঠী ভেঙ্গে যাচ্ছে। আবার সদস্যদের দেওয়া ট্রেনিং বাজারে চাহিদার সঙ্গে সংহতি না থাকার জন্য সেগুলি কোন কাজে আসছে না।

৮) সাধারন মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপ্রথাগত পেশায় যুক্ত থাকার ফলে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর নীতি মেনে চলা যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তাই নতুন গোষ্ঠী গঠনে অনীহা দেখা দেয়।

৯) পশ্চিমবঙ্গে বিভাজনের রাজনীতি অনেক সময় স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কার্যকলাপে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা আমরা এখানকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকা গুলোতে দেখতেও পাই।

১০) স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সাথে যেহেতু ব্যাঙ্কের যোগাযোগের একটা ব্যাপার থাকে , তাই আমরা দেখি যে SGSY এর বাইরের গোষ্ঠীগুলি আর কোন রকম ব্যাঙ্কিং সহযোগিতা পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার ঋণশোধ করার কড়াকড়ি কিন্তু এই গ্রামীণ দরিদ্র মেয়েদের গোষ্ঠী ছেড়ে বেরিয়ে আসার একটা বড় কারন।

অবশেষে বলা যায় যে, গ্রামের সাধারন মানুষের কাছে এই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ঠিকঠাক ভাবে না পৌচানোর জন্য-ই কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাধারন মানুষের টাকা আত্মসাৎ করছে। এক্ষেত্রে সাধারন মানুষের মুক্তি কিন্তু সরকারী সহযোগিতায় স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলির প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই।

পশ্চিম মেদিনীপুরের কয়েকটি স্বনির্ভরগোষ্ঠীঃ-

কয়েকটি পরিবার মিলে যেমন গ্রাম তৈরি হয়, তেমনি কয়েকটি গ্রাম নিয়েও আমাদের দেশ তৈরি হয়। তাই গ্রামকে বাদ দিয়ে কখনও দেশের কথা ভাবা যায় না। আর যখন প্রসঙ্গ আসে ভারতবর্ষ নামক দেশটির তখন তো কোন কথাই নেই। এখনও ভারতবর্ষের চারভাগের তিনভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন, তাদের উন্নতি না হলে কখনও ভারতবর্ষ উন্নয়ন শীলতার দৌড়ে পৌঁছাতে পারবে না। একই ভাবে আমরা দেখি যে, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দেন গ্রামোন্নয়নের ওপর। এবং তিনি প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি এবং পরবর্তী পরিকল্পনায় শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, আবার দেখা যায় পরবর্তী সময়ে সরকার গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার ও সূচনা হচ্ছে। সমাজের অর্থনৈতিকভাবে একইস্তরে থাকা কিছু মানুষ তাদের অর্থনৈতিক দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে এবং উন্নয়নের দিশা খুঁজে পাচ্ছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে

মহিলারা অংশগ্রহন করেছে, এবং মেয়েদের অংশগ্রহনের ফলে সমাজ এবং গ্রামের উন্নয়নে গতি বেড়েছে। কয়েক দশক আগে বিক্ষিপ্তভাবে উন্নয়নের জন্য দলবদ্ধভাবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ দেখা যায়। সরকারিভাবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিছু প্রকল্পের সূচনা হয়। যেমন,- ডোকরা প্রকল্প, আই. আর. ডি. পি সহ অন্যান্য প্রকল্প একসাথে যুক্ত হয়ে ‘স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা’ হিসাবে সারা ভারতে রুপায়িত হয়েছিল ১৯৯৯ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে। মোটামুটি ভাবে একই এলাকার ১০ থেকে ২০ টি দরিদ্র পরিবার থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে তৈরি হয় এই প্রকল্পের অধীনে স্বনির্ভর দল। এই দল নিজেরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলিকে মিলেমিশে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমাধান করে। প্রতি মাসে তারা নিজেরা নিজেদের সাধ্যমতো অর্থ দিয়ে চাঁদা তুলে সমাধান করার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে তারা পঞ্চায়েতের বা সরকারি বিভাগের সাহায্য নিতে পারবে। আবার তাদের যে, সামান্যতম জমানো টাকা আছে তা নির্দিষ্ট সুদে ধার নিয়ে কাজে লাগাতে পারবে। এইভাবে ৬ মাস চলতে থাকলে সেই গোষ্ঠীর মুল্যায়নের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মারফৎ ক্যাশ ক্রেডিটের সুবিধা পাবে। এবং এক্ষেত্রে এরা ১,২৫ লক্ষ্য টাকা পর্যন্ত অনুদান সহ ঋণ পেতে পারে। এর পরেও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর দলের সদস্যদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ম অনুযায়ী অর্ধেকদল মহিলাদের নিয়ে গঠন করার কথা বলা হলেও পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু গঠিত মোট দলের শতকরা ৮৪,৫৯ শুধুই মহিলা স্বনির্ভর দল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের মধ্যে আদিবাসী অধ্যুসিত জঙ্গলাকীর্ণ জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। সেখানে সাধারন মানুষ কৃষিঅর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। এখানে জঙ্গলে লোধা, শবর, জাতি থেকে শুরু করে, হাড়ি, মুচি, ডোম বিভিন্ন উপজাতি শ্রেনির মানুষের বাস। এই জেলাতে আবাদি জমির চেয়ে অনাবাদি জমি বেশি থাকার কারনে সমস্ত মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করতে পারে না। তারা

বিভিন্ন পেশায় নিজেদেরকে যুক্ত করে সারাবছর হয় শ্রমিকের কাজ নয়তো জঙ্গলের শালপাতা কুড়নো, কাট সংগ্রহ করে জীবন অতিবাহিত করে। তারা সারাবছর দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। তাই কখনও কখনও তারা পিঁপড়ের ডিম খেয়েও জীবন ধারন করে। অতএব মানুষের এই অবস্থার জন্য সরকারিনীতির উদাসীনতাকেও দায়ী করা যায়।

পশ্চিম মেদিনীপুরের অনেকগুলি স্বনির্ভরগোষ্ঠী থাকলেও যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করে চলেছে তাদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠীর কথা আমি আলোচনা করবো,-

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে সুবর্ণরেখার নদীর পাড়ে জঙ্গলে ঘেরা এক বিস্তীর্ণ জায়গা যার নাম 'নয়াগ্রাম'। আর এখানকার 'ঝগড়ি' , 'পাতিনার রামকৃষ্ণ' , 'ভাই ভাই' ও 'মাতঙ্গিনী' সহায়ক দল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছে। যেখানে বেশিরভাগ জমি অনাবাদী, যদিও চাষ হয় তা দিয়ে মানুষের সারা বছরের খাবার জোগাড় হয় না। তাদের কাছে বনজ সম্পদ সংগ্রহ একমাত্র উপায়। সেখানে শঙ্কর জানার মতো মানুষ, যে কিনা নিজের প্রচেষ্টায় স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের ব্যবহৃত অনাবাদী জমিগুলিকে একত্রিত করে ৮০ বিঘা জমিতে নার্সারির মধ্যে দিয়ে ৪০০০ কাজু, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, গাছ লাগিয়ে ৫ জন সদস্য ত্রিশ বছরের জন্য লিজ নিয়ে নিজেরা স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পাড়ি দিয়েছিল ২০০৭ সালে।[66] এক্ষেত্রে এর এই চুক্তিতে রাজি হয়েছিল যে, মোট উৎপাদনের ২৫ ভাগ পাবে মূলজমির মালিক। এবং বাকি ৭৫ ভাগ পাবে এই রামকৃষ্ণ সহায়ক গোষ্ঠী। যদিও এই দলের আবার বেশিরভাগ সদস্যই ছিল পুরুষ।

---

[66] অশোক কুমার কুণ্ডু (২০০৮) নয়াগ্রামের ঝগড়ি আর পাতিনার অনাবাদী জমিতে ফলবে কাজু, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, পঞ্চায়েতি রাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র, কলকাতা,প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা জানুয়ারি পৃ ২৫।

অন্য দিকে আমরা আরেকটি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কথা জানতে পারি তা রাধারানী জানার নেতৃত্বে গড়েওঠা 'মাতঙ্গিনী স্বনির্ভর দল'। এটা হচ্ছে ২০০৭ সালে সেই পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত বালিগারিয়া ১০ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝগডির মাঠে। তিনি হর্টিকালচার ট্রেনিং নিয়ে, ওড়িশার কেওনঝাড় থেকে চারাগাছ এনে এখানে জোড়া কলমের তৈরির জন্য ব্যবস্থা করেছেন এবং ভারমি সার(কেঁচো মাটি থেকে কিভাবে সার তৈরি করতে হয় সেও শিখেছেন) এ ব্যাপারে যদিও এন, জী, ও সাহায্য করেছে। আবার এই নার্সারির বাগান দেখাশোনা করার জন্য মাসে ৩০০ টাকা মাইনে দিয়ে কাজ দিয়েছেন গ্রামের একজন গরীব আদিবাসী শঙ্খ টুডুকে। এইভাবে রাধারানী স্বনির্ভর দলের স্বহায়তায় বাগডির মাঠে কাজুর বাগান তৈরি করে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে তার চার জন ছেলেকে বাইরের হোস্টেলে পড়াশোনার খরচ বহন করেছে।

আবার নয়াগ্রাম থানার খাস জঙ্গলঘেরা জায়গা পাতিনাতে ৬০ বিঘা জমিতে ভাই ভাই স্বহায়ক দলের অনুপ্রেরনায় আদর্শ বাগান গড়ে উঠেছে। ১১ জনের এই পুরুষ কেন্দ্রিক দলটি ২০০৬ সালে ৩৩ বছরের জন্য লিজ নেওয়া জমিতে বাগান তৈরি করে ২০০৯ সালে কাজু ফলায়।[67] সাথে থাকে আম, পেয়ারা, পেঁপে পাতিলেবুর মতো বিভিন্ন রকমের গাছ। বাগান তৈরির সময় প্রচুর পরিমানে শ্রমিকেরা কাজ পেয়েছিল। বিশেষত দরিদ্র পরিবারের লোধা, ভূমিজ, প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা। এখানকার এই দলের প্রধান ছিলেন শ্রী প্রেমাংশু দে। তিনি বলেছেন যে, বিশেষকরে এই বাগানের আয়তন বাড়িয়ে মুরগি, ছাগল, গরু ও তারা পালন করবেন। কেঁচো সার তৈরি থেকে গোবর সার সবই তাদের পরিকল্পনায় আছে বলে বলেন। সেখানে আরও জানাযায় নাকি এই দলের পাশে অনুপ্রেরনা জুগিয়েছেন পাশাপাশি ব্লকের বি,ডি, ও অফিসার।

---

[67] তদেব,

তবে আগে বিদ্যুৎ না থাকার কারনে হাতি এসে মাঝে মাঝে সব নষ্ট করে দিত যদিও এখন আর তা হয় না।

পশ্চিম মেদিনীপুরের এক বিরাট অংশ রয়েছে জঙ্গলাকীর্ণ বড় বড় শাল ও সেগুন গাছে ঘেরা সেই জঙ্গলে বহু উপজাতির মানুষের বসবাস। বিভিন্ন বনজ সম্পদ ও অরন্য সম্পদের ওপর নির্ভর করে তারা তাদের জীবন ও জীবিকা অতিবাহিত করে। ঘন জঙ্গলের উঁচু নিচু, ছোট বড় গাছ, লতা গুল্ম, কন্দ যেমন পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। একজন বেঁচে থাকে অন্যের সাহায্যে, তেমনি করে একে অন্যের সাথে হাত মিলিয়ে পটাশিমুল,নেদাবহরা, গামারিয়া, সর্পধরা, লোধাশুলি আরও আশেপাশের গ্রামের গরীব মেয়েরা আজ সংগঠিত হয়েছে। অন্ধকার ঠেলে ঠেলে কাটারি নিয়ে যেমন পাতা কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ঠিক একইভাবে তারা জোটবদ্ধ হয়ে দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে স্বনির্ভরতার আশায়। এইভাবে ঝাড়গ্রামের গ্রামীণ মেয়েরা দলবেঁধে পাতা কুড়িয়ে এনে রোদে শুকিয়ে এক হাজার পাতার বান্ডিল করে মহাজনের কাছে বিক্রিকরে তাদের দিন চলে যেত। তাদের জীবনের পরিবর্তন আসে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর দলের সদস্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠা বারোটি সঙ্ঘের মধ্যেদিয়ে তারা ‘অরন্য সুন্দরী’ নামে মহাসঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। যার ফলে গ্রামের দরিদ্র ও গরীব মেয়েরা শালপাতা সেলাই করে যে লাভটুকু পায় তা তারা মহাসঙ্ঘে জমা রাখে এবং এই তহবিল নিজেদের উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই ভাবনা মাথায় নিয়ে অরন্য সুন্দরীর সদস্যারা নিজেদের মধ্যে তৈরি করেছে এক বানিজ্যিক বন্ধন। বর্তমানে এই বারটি সঙ্ঘের প্রতিটিতে আছে ৫০- ১০০টি করে স্বনির্ভর দল। পাতার প্রয়োজন হলেই মহাসঙ্ঘ খবর পাঠায় দলগুলির কাছে, আর দলগুলি কাজ শুরু করে দেয়। শালপাতাকে নিয়ে গড়ে ওঠে

এক গভীর বন্ধন। বছরে দু’বার পাতার ঘাটতি হয় ফাল্গুন আর আষাঢ় মাসে। তখন স্টকে কিছু পাতা জমা থাকে তা দিয়ে কাজ চালায়।[68]

দেখতে যতটা সহজ বাস্তবে ততটা সহজ ছিল না এই গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন। কারন এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদেরকে এখনও বিভিন্নদিক থেকে দমিয়ে রাখার কথা ভাবা হয় প্রতিটি পদে। সেই জন্য তারা সেই শালপাতা বিক্রিকরে মহাজনের কাছেও ব্যাঙ্গার স্বীকার হয়,- “ শখের ব্যবসা কদিন টেকে তাই দেখুক। মেয়েরা করবে শালপাতার ব্যবসা”। অরন্য সুন্দরীর কোষাধ্যক্ষ মধুমিতার কথায় আমরা দেখি যে, তাদের একসাথে কাজ করতে আরও সাহস জুগিয়েছিল এই কথাগুলি। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর মেয়েরা ওড়িশার বালাসোর থেকে কলকাতা সবজায়গায় বাজার ধরতে যায়, যাতে তারা আরও বেশিকরে লাভের মুখ দেখতে পায়। গোষ্ঠীর সদস্যরা মহাসঙ্ঘের কাছে পাতা দেয়, কারন তাদেরকে মহাসঙ্ঘ মহাজনের চেয়ে এক হাজার পাতায় দশ টাকা করে বেশি দেবে। শালপাতা ব্যবসার কাজ পরিচালনার জন্য অরন্য সুন্দরী পরিচালন সমিতি এই দলের সদস্যের নিজের গাড়িতে করে বানিজ্যিকরন করে। ফলে মহাজনের কাছে ধারের কবলে কাওকে পড়তে হয় না। মহাসঙ্ঘের নেতৃরাই সবকিছু পরিচালনা করেন। তাই এদের হাতেই এখন জঙ্গলের অর্থনীতি নির্ভর করছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৬% মহিলা জনজাতি বাসকরে এই রাজ্যে তাদের মধ্যে আবার ৩৮ রকমের গ্রুপ আছে, জাদেরকে মোটামুটি ভাবে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- খুব ছোট, ছোট, মাঝারি, বড়, খুব বড়। এরা এবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যেমন,- সবচেয়ে

---

[68] শাল পিয়ালি অরন্য সুন্দরীর ইতিকথা,(২০১৩), পঞ্চায়েতি রাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র, কলকাতা,প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা জানুয়ারি পৃ ৩০।

বেশি সংখ্যক উপজাতি বসবাস করে সাঁওতাল যারা খুব বড়, শুধু বড় হল- ওঁরাও, মাঝারির মধ্যে পড়ে ভূমিজ ও মুন্ডা উপজাতির মানুষরা, ছোট উপজাতির মধ্যে পড়ে- করাম, লোধাস, খেরিয়া, মাহালি, ভুটিয়া, শবর ইত্যাদি। এছাড়াও ২৯ রকমের উপজাতি আছে খুব ছোট ছোট। এরা বেশিরভাগই বনজ সম্পদ আহরন করে জীবন ধারন করে এবং জঙ্গলে বসবাস করে। বিভিন্ন কাজে তারা পুরুষদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। সমাজে এরা বঞ্চিত, নিপীড়িত, অনেক ক্ষেত্রে সমাজ এদেরকে চোর, ডাকাতের বদনাম নিয়ে ও কাটাতে হয়। এদের উন্নয়নে না কোন পঞ্চায়েত ও রাষ্ট্র কেউই তেমন ভাবে হস্তক্ষেপ করে না।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আর একটি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কথা আমি আলোচনা করবো। তা হল, নারায়নগড় ব্লকের দহরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের লোধা মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে স্বনির্ভরতালাভ করে সমাজ ও রাষ্ট্র কে দেখিয়েছে যে কিভাবে নিজের ভালো নিজেই করা যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়নগড় ব্লকের দহরপুর শবরপল্লীর লোধা মহিলারা মোট ৬০ জন মহিলা মিলে ৬টি স্বনির্ভরগোষ্ঠী করেছে।[69] প্রথম দুটি গোষ্ঠী তৈরি করে ২০০৫ সালে নাম হয় ‘নেতাজী স্বনির্ভরগোষ্ঠী’, আর ‘ক্ষুদিরাম স্বনির্ভরগোষ্ঠী’। পরে ২০০৮ সালে বাকি চারটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, যাদের নাম হল- বিনয়, বাদল, দীনেশ ও মা কালী স্বনির্ভরগোষ্ঠী। প্রতিটি গোষ্ঠীতে ১০ জন করে মহিলা, প্রতি জন ৪০-৫০ টাকা করে জমা দিয়ে একটা যৌথ তহবিল তৈরি করে। খুব ভাবনার বিষয় যে, এদের মধ্যে মাত্র চার জন মহিলা লেখাপড়া জানত, আর বেশির ভাগটাই ছিল পড়াশোনা না জানা মানুষ। প্রতিটি গোষ্ঠী খুবই সক্রিয় ছিল। তারা প্রতি মাসে চারবার শুধু শীতের দিনে দু’বার দহরপুর প্রাইমারী স্কুলে বিকাল চারটায় রেজিস্টার খাতা নিয়ে মিটিং বসত। তাদের নিজস্ব

---

[69] Panda, Santamu, Status of Women Self Help Groups Among the Lodhas of Daharpur Village in Paschim (west) Medinipur, West Bengal, India: An Anthropological Perspective, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies, 2014, Vol 1, No.3, 21-29

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল। এদের মধ্যে নেতাজী ও ক্ষুদিরাম গোষ্ঠী ছিল খুবই শান্তি প্রবন। এই গোষ্ঠীর মহিলারা বেশির ভাগই নিজের নাম সই করতে পারত। পরবর্তীকালে এরা যাদের জমি ছিল না তাদের কে জমি, যাদের পাট্টা ছিল না তাদের পাট্টা এবং লোণ থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তবুও তারা পিছিয়ে যায়নি গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার দৌড়ে, তারা এগিয়ে তাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি পঞ্চায়েত থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি যে নিজের মতো করে তারা জমি পাছে এবং স্থানীয় বাঙ্কিং সহযোগিতাও পাচ্ছে আজ তারা গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের কাছে বিশেষভাবে স্বনির্ভর হওয়ার মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর মধ্যে দিয়ে নারী ক্ষমতায়ন ও ঘটিয়েছে যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

১ Faizi, Dr. Amir Afaque Ahmad. 2009. Self Help Groups and Marginalized Communities, Concept Publishing Company , New Delhi p 102

2 Sengupta Rajdeep and Aubuchon, Craig p.(2008).“The Microfinance Revolution and Overview”, Federal reserve bank of st. Louis reviw, 90(1), January/ February, P.28

3 Status of Microfinance in India 2011-12, Microcredit Innovation Department National Bank for Agriculture and Rural Development , Mumbai, P 1

4 A hand book on forming self help Groups (SHGs) Microcredit Innovation Department , National bank for agriculture and rural development, Mumbai year not mentioned, p.12

5 Swarnjayanti gram swarozgar yojana(SGSY), (2004). Training manual for bankers and DRDA Officials, Ministry of rural development , government of india , New Delhi , PP. 11-15

6 Sen, Manab . (2005) , Study of self help groups and microfinance in west Bengal , SIPRD and Dasgupta and co.pvt. ltd.,Kolkata, p.33

7 Almond, Gabriel A. and powell jr., G, Bingham. (1966). Comparative politics: A developmental approach, little, brown and company, boston, pp.74-76

8 Srivastava, kalka, (2005). Self help groups and civil society: A preliminary study, indian social Institute , New Delhi, Reprint, p.2

9 Mondal, sagar and ray, G.L.(2007). Text book of rural Development , Kalyani publishers , Kolkata , p.131

10 Ragi gain, T.S.et al, (2000) trainer; manual on self help groups , bankers institute of rural development , Lucknow, allied publishers Ltd., New Delhi, p81

12 Lalitha, Dr, N,(2003), main streaming microfinance, mohit publications, New Delhi, P33

13 Yunus, Muhammad , 2004. "Grameen bank, microcredit and millennium development goals", economic and political weekly, September 4, p4080

14 Harter, mancolm,(2003) Political microfinance: A training guide for south asia , vistar publication, New Delhi, pp105-111

15 Harper, Malcolm. (2002) " Grameen bank groups and self help groups: what are the difference?"

16 Report: status of microfinance in india 2011-12 National bank for agriculture and rural Development , microcredit innovation department , Mumbai.p1

17 সেন, মানব (২০০৩) “স্বনির্ভর দল ও সহভাগী উন্নয়ন”, পত্রিকাঃ পশ্চিমবঙ্গ, গ্রামোন্নয়ন বিশেষ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মার্চ, পৃ ১০৮

18 চাকি, শ্রী সৌরভ (২০১২), “রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আন্দোলন”, পঞ্চায়েতী রাজ, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সামাচার পত্র, কলকাতা, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মারছ,পৃ ১১

19 দাস বাদল চন্দ্র (২০১২) “গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সহযোগী সংস্থার লোকজন”, পঞ্চায়েতী রাজ, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র, কলকাতা, পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মে, পৃ ২২-২৩

20 ব্যানাজী, শাশ্বতী (২০১১) “স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা”, পঞ্চায়েতী রাজ, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র, কলকাতা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, পৃ ৬-৭

21 দত্ত , প্রভাত (২০১২), “পশ্চিম বঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও গরীব মেয়েরা”, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র, কলকাতা, পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মে, পৃ ৬

22 ভট্টাচায, স্বাতী (২০০৮), “পার্টিতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্র, দুইয়ের সঙ্গে লড়ছে মেয়েরা”, আনন্দ বাজার পত্রিকা (দৈনিক), কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর, পৃ ৪

23 ভট্টাচায, স্বাতী (২০০৯), “এ পরিবর্তন গরীব মেয়ের রুটি যোগায় না”, আনন্দ বাজার পত্রিকা (দৈনিক), কলকাতা, ২৪ জুন, পৃ ৪

24 ভট্টাচায, স্বাতী (২০১১), “দারিদ্রের চেয়ে বড় ঝুঁকি আর কিছু নেই”, আনন্দ বাজার পত্রিকা (দৈনিক), কলকাতা, ৫ ই জানুয়ারী , পৃ ৬

তৃতীয় অধ্যায়

স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন

"When we empower women, we empower communities nationa and the entire human family"

UN Secretary-General Ban ki-moon,(UN WOMEN ANNUAL REPORT 2010-11, P-2)

"নারী ক্ষমতায়ন" শব্দটি বর্তমান বিশ্বে যথেষ্ট গুরুত্ত্বপূর্ণ। কারন পুরুষ শাসিত সমাজে যেখানে নারীরা কেবলমাত্র তাদের দ্বারা শোষিত, শাসিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত তারা যদি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে তখন এই শব্দটার বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটে। আবার বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা থেকে যানা যায় যে, সমাজ উন্নয়নের জন্য নারী ক্ষমতার প্রয়োজন যথেষ্ট। এক্ষেত্রে আমি আলোচনা করবো যে, ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে এবং বিশেষত পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ে কিভাবে নারীরা স্বনির্ভরতা লাভ করছে, এবং এই স্বনির্ভরতা কিভাবে তাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে। এবারে আমরা নারী ক্ষমতায়নকে বোঝার আগে 'ক্ষমতা' কাকে বলে সে প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করবো।

'ক্ষমতা' শব্দটি ক্ষমতায়নের সাথে, বিশেষকরে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। সহজভাবে বলা যায় ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ তার নিজের শরীর, মন এবং কাজের ওপর সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যদি ক্ষমতায়ন ঘটে তবে সে যেকোনো সিধান্তগ্রহন ও বাস্তবায়নে সরাসরি অংশগ্রহন করবে

এবং প্রয়োজনে ওই ব্যক্তি সিধান্তকে প্রভাবিত পর্যন্ত করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের সম্পদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তার ক্ষমতায়ন ঘটে। সেই অর্থে ক্ষমতা সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ। জাতিসংঘের ৫ টি নির্ধারকের ওপর ভিত্তি করে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। Power বা ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন।–

হাওলে(Howley) এর মতে প্রত্যেকটা সামাজিক কর্মই ক্ষমতার অভিজ্ঞতা, প্রত্যেক সামাজিক ক্ষমতাই সমীকরণ,(Power equation).

মার্টিন বলেন যে, ভালোবাসার মতো ক্ষমতা সাধারনভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারন বক্তব্য রাখার সময় বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই কেবলমাত্র অনুভুতি বলেই গৃহীত হয়, সংজ্ঞায়িত হয় কদাচ। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ক্ষমতা হচ্ছে মরিচিকা মানুষকে তা লাভ করার জন্য দিগভ্রান্ত করে দেয়।

আইনন নাহার মিজান এর মতে,-“ ক্ষমতা বিষয়ে গবেষণা করেছে সমাজ বিজ্ঞানের বহু শাখা, এবং প্রত্যেকেই সংজ্ঞায়িত ও পরিমাপ করেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, এবং এ পর্যন্ত ক্ষমতার ধারনা সম্পর্কে কোন সাধারন ঐক্যমত নেই।[70]

মিশেল ফুকো তাঁর লেখা “ The Archaeology of Knowledge(1969)” গ্রন্থ এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে Discursive Formation শীর্ষক অলোচনায় বলেন যে, আধুনিককালে ক্ষমতা সর্বব্যপ্ত। এর অনেক জালিকা(grid)। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নালিকার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা পৌঁচে সমাজ দেহের সর্বত্র, এই ক্ষমতার কোন নির্দিষ্ট ‘লোকাস’ বা ধারক ব্যক্তি কিংবা শ্রেণী নেই। ক্ষেত্র

---

[70] Mizan, Ainon Nahar, Quest of Empowerment, The University Press Limited, Dhaka-100, Bangladesh, p.50

বিশেষে ক্ষমতার ক্রিয়া প্রণালী, কার্জ বিধি বা প্রকৌশলের রূপই বিচার্য। ক্ষেত্রবিশেষ ক্ষমতার সম্পর্কের দ্বারা কিভাবে গঠিত হয় তাই অনুসন্ধান বিশ্লেষণের বিষয়।

The Oxford English Dictionary দেখলে শব্দটির যে দুটি অর্থ পাওয়া যায় তা হল, - প্রথমতঃ- ক্ষমতা হল কোন কিছু বা কোন কাজ করার সামর্থ্য। Power to do Something। দ্বিতীয়তঃ- Power to Over যার অর্থ হল, অপরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা হুকুম জারি, আধিপত্য, শাসন, প্রভাব প্রতিপত্তি বা কতৃত্ব কায়েম। এক্ষেত্রে একটু ভালো করে বুঝতে গেলে দেখা যায় যে, এই দুটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত Power to ছাড়া কখনও Power over সম্ভব নয়।

প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেটার বৃদ্ধি ঘটে মানুষের আকাঙ্খার ভিতর দিয়ে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত ফ্রেডরিশ উইলহেম নিটসের লেখা, “ The Will to Power” গ্রন্থের ‘will to power’ একটি অর্থ একই। অর্থাৎ মানুষ সমবেতভাবে এমন সব ক্রিয়া সম্পাদন করে যেগুলো একা করতে পারে না। অতএব যৌথভাবে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন মানুষ জোট বাঁধে তখন তাঁর আত্মবিশ্বাস , আত্মসচেতনতা, নিজের মতামত প্রকাশ করার সাহসকে ক্ষমতা বলে।[71]

আবার, নায়লা কবির(Naila kabeer) বলেছেন যে,- ক্ষমতায়ন ধারনা ব্যবহারের বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন মাত্রা, বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও এর কেন্দ্রীয় ধারনা হল “ক্ষমতা”।[72]

---

[71] দীপক কুমার দাশ (২০০৪) “ ক্ষমতা ও আধিপত্যঃ তত্ত্ব চর্চার রূপ রেখা”, সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পা), রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, প্রকাশন একুশে, কলকাতা, পৃ, ৮৪-৮৬

[72] Kabeer, Naila.(1999). “ The Conditions and Consequence of Choice: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment”, United Nation Research Institute for Social Development Discussion Paper, No. 108, August, p. 2.

পরবর্তী সময়ে ৯০ দশকে আমরা দেখি বিশ্বব্যপী অনুষ্ঠিত বিশ্বপর্যায়ের অধিকাংশ সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমতায়ন ধারনাটি বিশেষভাবে সামনে আসে ১৯৮৫ সালে নাইরোবি বিশ্ব নারী সম্মেলনে ক্ষমতায়নের ধারনাটি ব্যখা করতে গিয়ে বলেন-"Empowerment is a redistribution of power and control of resources in favour of women through positive intervention,

সুদিপ্ত অধিকারী এবং রতন কুমার তাদের " Geography of Gender Discrimination in India: An Analysis"(2006)। প্রবন্ধে ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে ব্যাখা দিয়ে বলেছেন- ক্ষমতায়ন হল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সন্নিবেশ এবং তা বিচার করতে হবে ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যা ও চাহিদা নির্ধারণের প্রেক্ষিত থেকে। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সমাজ ব্যবস্থায় এক এক রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে নারীরা প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া ও জানাচ্ছেন। এবং নিজের অধিকার দাবী সমর্থ বুঝে নিতে চাইছেন। ফলে সমাজ নিরিখে নারীরা ক্ষমতায়ন এক বহুমুখী প্রক্রিয়া।

ক্যরলিন মসার তাঁর " Gender Planning and Development: Theory Practice and Traning"(1990) নামক গ্রন্থে ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,- ক্ষমতায়নের মধ্যে দিয়ে নারীর আত্মনির্ভরশীলতা এবং আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ ঘটে। তিনি আরও বলেন

যে,- ক্ষমতায়নের মধ্যে দিয়ে নারীর বস্তুগত সম্পদের নিয়ন্ত্রনের জীবন তাঁর নিজের পছন্দকে সুনিশ্চিত করে।[73]

রোকেয়া কবির তাঁর "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" (২০০৩)। নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,- ক্ষমতায়ন হচ্ছে মানুষের জীবনের পাশাপাশি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন। তিনি আরও বলেন যে,- শুধু ক্ষমতা থাকা মানে উঁচু পদে থেকে ক্ষমতা দেখানো নয়, নিচে থেকে তাদের কাজের মধ্যে অংশ নেওয়াও, শুধু সম্পদ থাকা নয় সম্পদের ওপর পূর্ণনিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন।

কেট মিলেট(Kate Millett) তাঁর " Sexual Politics"(1970) গ্রন্থে বলেছেন,- যে এই ক্ষমতার বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে নারী পুরুষকে স্পষ্ট ভাবে চেনে এবং নারীকে ক্ষমতার প্রান্তিক স্তরে ঠেলে দেয়। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন কিভাবে ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রে থাকা পুরুষ নারী, পরিবারসহ সমগ্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।[74]

অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ (Anirudh Krishna) তাঁর "Social capital, community Dsiven Development and Empowerment A Short Note on concepts and Oparetions"(2003)। প্রবন্ধে ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা দিয়েছেন- "Empowerment is understood as increasing the capacity of individuals or groups to make effective development and life choices and to transform these choices into desired actions and outcomes".

---

[73] Moser, Caroline O. N. (1993). Gender Planning and Development: Theory Practice and Training, Routledge, London and New York, pp. 74-75

[74] Millett, Kate.(1970). Sextual Politics, Doubleday, Garden City, New York, pp.23-46.

গীতা সেন তাঁর “Empowerment as an Approach to Poverty”(1997)। নামক গবেষণা প্রবন্ধে ক্ষমতায়নের ধারনার ব্যাখা দিয়ে বলেছেন যে, ক্ষমতায়নের দুটি দিক আছে,- প্রথমতঃ- সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ(বস্তুগত, মানবিক, বউদ্ধিক, আর্থিক, ও আত্ম)। দ্বিতীয়তঃ- আদর্শের ওপর নিয়ন্ত্রন(বিশ্বাস, মুল্যবোধ, ও আচরন সমূহ)। তিনি আরও বলেন যে, ক্ষমতার অর্থ যদি হয় নিয়ন্ত্রণ, তাহলে ক্ষমতায়নের অর্থ হবে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন হয় সেই প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ। বিশ্বব্যপি ছড়িয়ে থাকা অসংগঠিত প্রান্তিক দরিদ্র বা ক্ষমতাহীন মানুষের কাছে যৌথ সংহতি একটা শক্তিশালী প্রতিপালক বল হিসাবে কাজ করে।

মিশেল ফুকো (Michel Foucault) “Discipline and Punish: The Birth of the Prison”(1975)। নামক গ্রন্থে ক্ষমতাকে তিনটি দিকে বিশ্লেষণ করেছেন- উৎস, প্রয়োগ পদ্ধতি, প্রয়োগের ন্যায় সঙ্গতা। তিনি আরও বলেন যে, ক্ষমতার খেলা সর্বত্র বিদ্যমান প্রভু ও অধস্তন পক্ষের মধ্যে।[75] মানুষের ধর্ম হচ্ছে যেখানেই প্রভুত্ব সেখনেই পাল্টা প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ গড়ে তোলা। আবার তিনি এটাও বিশ্বাস করেন যে, এই বিদ্রোহগুলির পরাজয় সর্বদা অনিবার্য নয়।

অমর্ত্য সেন তাঁর বিভিন্ন লেখাতে নারী জাতির বিস্তৃততর ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, কার্যক্ষেত্রে স্ত্রী জাতির ভূমিকা যত সংকীর্ণ হবে ততই তা নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিশু ও বয়স্ক সবার ওপরেই মন্দ প্রভাব বয়ে আনবে।[76] আবার তিনি এই নারীর ক্ষমতায়নের ধারনার মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন এক “ Capability”।

---

[75] আকাশ, এম , এম। (২০০৭) “ ক্ষমতা প্রশ্ন ও মিশেল ফুকোর মতামত” পারভেজ হোসেন (সম্পাদিত), মিশেল ফুকোঃ পাঠ ও বিবেচনা, সংবেদ, ঢাকা, পৃ ২০০

[76] অমর্ত্য, সেন(২০০৫), উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা, (বাংলা অনুবাদ-অরবিন্দ রায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ১৮৮।

ওপরের উল্লিখিত এই ক্ষমতায়নের সংজ্ঞার থেকে নির্ধারণ করা যায় যে, ক্ষমতায়ন ধারনাটি বিশেষ করে নারীকে কেন্দ্রকরে আবর্তিত হয়। ক্ষমতায়ন হল এমন এক পক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ বা প্রায় মুক্ত হয়ে এমন এক সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করবে যা তাঁর নিজস্ব পছন্দ ও ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে আরও বলা হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত ও অবস্তুগত নিয়ন্ত্রনের সক্ষমতার মধ্যেদিয়ে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ নির্ধারণ করার এবং জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার অধিকারকে ক্ষমতায়ন হিসেবে মনে করা জেতে পারে। সেজন্য ক্ষমতায়নকে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়। তবে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ব্যক্তির নিজস্ব জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে ও গভীরভাবে যুক্ত। এই জন্য নারীর ক্ষমতায়নকে এক বহুমুখী , বহুগামি, ও বহুস্তরীয় প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নত করা হয়।

ক্ষমতায়ন পদ্ধতিঃ-

ক্ষমতায়ন পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষমতা ও উন্নয়নের মধেকার এক ধরনের আন্তঃ সম্পর্ক। এই দুটি বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের নতুন দিক নির্দেশনা দেয়। এই ক্ষমতায়ন পদ্ধতি অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয় বরং ব্যক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বদেয়, স্বীকৃতি দেয়। সেই সঙ্গে তা ব্যক্তির নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার ইঙ্গিত বহন করে। এই স্বনির্ভরতার মাত্রা নির্ভর করে ব্যক্তি তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্পগুলো গ্রহন করতে পারছে কি না তার ওপর। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করতে পারছে কি না তার ওপর নির্ভর করে ব্যক্তি কতটা ক্ষমতায়নের কাছাকাছি আসতে পেরেছে। ক্ষমতায়নের জন্য

স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহনের কথা বলে থাকেন বিশেষজ্ঞগন। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের জন্য প্রয়োজন হয় লিঙ্গ সম্পর্ক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা। শ্রেণী ও জাতির মধ্যেকার বৈষম্য মূলক কাঠামোর বিলুপ্তি এর লক্ষ্য। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের জন্য প্রয়োজন হয় স্থান, কাল, সাংস্কৃতিক, ধর্মিয় বৈচিত্র বিবেচনায় এনে সকল প্রকার ঔপনিবেশিক, নব্য ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ হতে জাতীয় মুক্তি, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় কৃষি, শিল্পের বিকাশ, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক কোম্পানির ওপর ব্যপক নিয়ন্ত্রণ। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বৈচিত্রকে বিবেচনায় রেখে সর্ব্বজনীন কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করতে হয়। একই সাথে এই কর্ম পরিকল্পনায় বিরাজমান আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উপাদান সমূহ সম্পৃক্তকরা ও জরুরি।

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ গুলো ও বিবেচিত হয়ে থাকে নির্দিষ্ট জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিধিতে বিরাজমান নারীর তাৎক্ষনিক সংকট বা প্রয়োজন মেটাবার দিকে লক্ষ্য রেখে। ভোটাধিকার প্রয়োগের মত বিষয়, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে বিরাজমান মজুরী বৈষম্য, নারীর ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সংসদ-সহ বিভিন্ন গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলো স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হতে পারে।[77] স্বল্পমেয়াদী অথবা দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আর্থ- রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং যুদ্ধের মতো যে সমস্ত বিষয়গুলো সাধারন জনগনের পাশাপাশি নারীকেও বিপন্ন করে তুলে, সেই সমস্ত বিষয় ও উপাদান কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

---

[77] শিকদার, শিরীন, সেলিনা- বাংলাদেশে নারী আন্দোলন অ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঢাকা, ২০০৫, পৃ ২১৯-২২০।

নারীর ক্ষমতায়নের একটি তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতঃ-

'নারী ক্ষমতায়ন' সম্পর্কে আলোচনায় পটভূমিতে যে প্রসঙ্গগুলি অনিবার্য ভাবেই মনে রাখতে হবে তা হল- নারীর বঞ্চনা, লিঙ্গ বৈষম্য, নান বিধ সামাজিক শোষণ, প্রতিকুল জৈবিক জীবনযাত্রার মান ও আরও কিছু আনুসাঙ্গিক বিষয়। 'নারীর ক্ষমতায়ন' বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য ও তার ব্যপ্তি সম্পর্কে সম্যক ধারনা পেতে হলে বিষয়টির তাত্ত্বিক ধারনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন রয়েছে।

'ক্ষমতায়ন' শব্দটির তার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা জেতে পারে। ক্ষমতা থেকে যে বঞ্চিত, বলা ভালো যার ওপর ক্ষমতার চাপ আছে সেই চাপের বিরুদ্ধে চলাই তার পক্ষে ক্ষমতার দিকে চলা। আমাদের সমাজে সবচেয়ে শক্তিশালী অনুশাসন হচ্ছে পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার জাল পুরুষের অধীনে করেছে নারীকে। যুগ যুগ ধরে পুরুষকে দিয়েছে অসীম ক্ষমতা, নারীকে করছে ক্ষমতাহীন। এলিজাবেথ কেডি তাই যথার্থই বলেছেন " মানব জাতির ইতিহাস হচ্ছে নারীর ওপর পুরুষের ক্রমাগত পীড়ন ও বল প্রয়োগের ইতিহাস। যার লক্ষ্য নারীর ওপর পুরুষের একছত্র স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা"।[78]

সম্ভবত মানব জাতির সমগ্র ইতিহাস নয়, বরং পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে থেকেই শুরু হয় নারীর ওপর পুরুষের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই ইতিহাস নারীর ক্ষমতায়নের নীলনক্সা তৈরি করে রাষ্ট্রীয় ও আইনগত কাঠামোর ফ্রেমে, তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দৃঢ়তর করে তাকে পিছনে হটানর প্রহসনের ইতিহাস। পুরুষের এই স্বৈরাচার, এই পীডনে ও বল প্রয়োগের রাষ্ট্রীয় নীতি বা আইন বহির্ভূত নয়; যত আইন প্রনিত হয়েছে পুরুষ কর্তৃক, যেখানে সর্বদায়

---

[78] নিউ ইয়র্কের সেনকা ফলস (১৯৪৮)-এ প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডিস্টান্টনের উক্তি।

পুরুষের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে, আর বিচারকরা এই বিধি বিধানকে বৈধ করেছে নীতিস্তরে এগুলোর উত্তরন ঘটিয়ে।

‘পুরুষতন্ত্র ও লিঙ্গ বৈষম্য’ ধারনা পুরুষকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব। তাকে প্ররোচিত করেছে নারী ও পুরুষের জন্য ‘ ভিন্ন পরিমণ্ডলের’ ধারনাকে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে। এই ‘ ভিন্ন পরিমণ্ডলের’ ধারনার উদ্ভব ঘটিয়েছে ‘ লিঙ্গ বৈষম্য ভিত্তিক শ্রম বিভাজন ধারনা অথবা উলটো ভাবে এই লিঙ্গ বৈষম্যের ধারনাই’ হয়ত বা সৃষ্টি করছে’ ভিন্ন পরিমণ্ডলের’ আওতাধীন ‘ বৈষম্যমূলক শ্রম বিভাজনের নীতিমালা’। এটিকে যেভাবেই দেখা হোক এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শ্রমবিভাজন হল নারীর ক্ষমতা চ্যুতির জন্য পুরুষের ছুঁড়ে দেওয়া প্রথম অস্ত্র। এই প্রসঙ্গেই এঙ্গেলস্(১৮৪৮) বলেছেন; মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ নারী জাতির ঐতিহাসিক পরাজয়।

মাতৃতন্ত্র হতে পিতৃতন্ত্রে উত্তরনের প্রথম ধাপটি হল নারীকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে বহিষ্কৃত করে তাকে গ্রহস্থালির কাজে আবদ্ধকরে ফেলা। এঙ্গেলস একে ‘ঘরোয়া ঝি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই ‘ ঘরোয়া ঝি’ রা ক্ষেত্র বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও তার ক্ষেত্র ও নীতি ছিল বৈষম্যমূলক, নিপীড়নমূলক। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের প্রথম সুত্রপাত ঘটে ১৮৫০ সালের ৮ই মার্চ। ওই দিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে শ্রমিক নারীরা সমানাধিকারের দাবিতে প্রথম রাস্তায় নামে।

নারী আন্দোলন ১৮৫০ সালে শুরু হলেও এর পেছনে ক্রিয়াশীল চেতনা ‘ নারীবাদ’ এর উদ্ভব ঘটে মুলত ১৭৯২ সালে ম্যারি উলস্টন ক্রাফট রচিত গ্রন্থ ‘ ভিন্ডিকেসান অব দ্যা রাইটস অব ওম্যান’ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ১৯২০ সালে ২৬ অগাস্ট মার্কিন কংগ্রেসে নারীর ভোটাধিকার ‘১৯তম’ সংশোধনী বিল পাস হয়। ভারতীয় নারীরা ভোটাধিকার পায় ১৯২১ সালে। এই

ভোটাধিকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের পদচারনার দ্বার খুলে দেয়। ১৯৬০ সাল থেকে নারীরা সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহনে সক্ষম হতে থাকে। চিরায়ত গণ্ডীর বাইরে যখন নারীরা পদচারন শুরু হয় তখনই উদ্ভব ঘটল ‘উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহন’ – এর প্রক্রিয়াটি যা ‘women in development’ বা WID নামে পরিচিত। সময়ের দাবী ও কালের বিবর্তনে ‘ উন্নয়নে নারী অংশগ্রহনের’ ধারা ভিন্ন ভিন্ন রুপে প্রতিভাত হতে থাকে। পাঁচটি পর্যায়ে এই ধারাকে বিনস্ত করা যায়। যেমন-

কল্যানমুখী আপ্রোচ(Welfare Approach):-

১৯৫০-৬০ দশকে উন্নয়নে নারী অংশগ্রহনের ক্ষেত্রটি ছিল ভালো ‘স্ত্রী’ বা ভালো ‘মা’ রুপে নারীকে গড়েতোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ‘মা’ উৎকৃষ্ট নাগরিকের জন্ম দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এই সময় পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে দক্ষ করে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

সমতাভিত্তিক আপ্রোচ(Equity Approach):-)-

১৯৭৫ সময়কালে অর্থাৎ জাতিসংঘ ঘোষিত নারী দশকে এই প্রত্যয়টি জোরদার হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হতে থাকে এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও তার দক্ষতায়ন ‘সিডও’(CEDAW) বা Convention on the elimination of all forms of discrimination against women অর্থাৎ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ।

দক্ষতাবৃদ্ধি অ্যাপোচ(Efficiency Approach):-

১৯৮০-৯০ এর দশকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর। যাকে মুলত নারীর উন্নয়ন বলা চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা কোটা ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

দারিদ্রবিমোচন অ্যাপ্রোচ(Anti-poverty Approach):-

দারিদ্রবিমোচন কর্মসূচি গত শতাব্দীর ৮০ র দশক থেকে শুরু হয়। এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরন ও তাদের কর্মসংস্থানের জোগান দিয়ে জাতীয় দারিদ্র দূরীকরণ আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্ত করা।

ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ(Empowerment Approch):-

বিগত শতাব্দীর ৯০ এর দশক থেকে এই আপ্রোচটি জোরদার হয়ে ওঠে। এই আপ্রোচের সারকথা হচ্ছে নারীকে কেবল অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই যথেষ্ট নয়। বরং জীবনের সকল পর্যায়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। একেই এক কোথায় বলা হয় ক্ষমতায়ন। নারীরা ক্ষমতায়ন এর বিষয়টি ৯০ এর দশক থেকে নারী আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিনত হয়। যার বহি:প্রকাশ ঘটে ভিয়েনা সম্মেলন ১৯৯৩ এবং জাতিসংঘের নারী সম্মেলন(২০০০) এ।

একদিকে পুরুষ শাসিত সমাজের নারীর বঞ্চনা, শোষণ ও দমনের ঐতিহ্য, অন্যদিকে দেশে দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সূচনার বিকাশ এরকম জটিল পটভূমির মধ্যে থেকেই অঙ্কুরিত

হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ। আরও স্পষ্ট বলতে গেলে এখন থেকে প্রায় দুই দশক আগে যখন মানব উন্নয়নের সুচকের ধারনা দেশে বিদেশে চর্চিত ও গবেষিত হতে শুরু করলো, ঠিক তার অব্যবহিত পরেই ‘ নারী ক্ষমতায়ন’ প্রসঙ্গটি আবির্ভাব হল।

আজ থেকে চার পাঁচ দশক আগে পর্যন্ত কোন দেশের জনসাধারনের আর্থিক ও সামাজিক ভালো মন্দ পরিমাপের জন্য যে ধারনাগুলি প্রচলিত ছিল তা হল সেই দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, দরিদ্র সীমারেখার ওপরে বসবাসকারী মোট মানুষের সংখ্যা ইত্যাদি। কিন্তু এই সব সমষ্টিগত পরিমাপক যে পুরুষ নারী নির্বিশেষে জনসাধারনের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রকৃত প্রতিফলক হতে পারে না, তা অনেক আগেই পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন। আর এই সব নতুন গবেষণার সুত্র ধরেই উঠে এসেছে নারী পুরুষের সামাজিক বৈষম্য ও নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটি

ক্ষমতায়ন বিষয়ে দেশ বিদেশের যেসব অর্থনীতিবিদ গবেষণা করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তিনি প্রথমে দেখিয়েছেন খাদ্য বণ্টন থেকে শুরু করে শিক্ষা- স্বাক্ষরতা , পুষ্টি, স্বাস্থ, পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকা প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষের স্বাপেক্ষে নারীরা ধারাবাহিক বঞ্চনার স্বীকার। এই প্রবনতাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন ‘লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত’ (Sex bias) নামে। এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত সুত্রের আকারে তিনি মন্তব্য করেছেন “ সামাজিক নানান ব্যপারে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এই পক্ষপাতের ভিত্তিতে” (সাধারনত সেই অসাম্যতা যায় নারীদের বিপক্ষে) এই ধরনের পক্ষপাতের নাম দেওয়া হয়েছে ‘Sex bias’ বা ‘লিঙ্গ ভিত্তিক পক্ষপাত। এই ধরনের পক্ষপাতের নিদর্শন কিরকম হতে পারে, তার অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরেছেন অমর্ত্য সেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়। তাঁর অভিমত হল

শুধুমাত্র দেশেরে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রগতির মাধ্যমে নারী বিরোধী পক্ষপাত তথা নারী জাতির ওপরে বহুমুখী অবহেলা নিরসন সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিকল্পনা, যার নাম ‘Women Agency’ বা নারী কতৃত্ববাদ। কিন্তু প্রকৃত ‘নারী প্রগতি’ বা ক্ষমতায়নের এই পদক্ষেপ কিভাবে রুপায়িত হতে পারে তা যথাযথ উত্তর দিয়েছেন অমর্ত্য সেন। তাঁর মতে, মূলত দুটি পদক্ষেপ এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ- ক) নারীর মধ্যে স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রসার খ) নির্দিষ্ট মজুরী বা মাহিনার বিনিময়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহন এবং সেই সুত্রে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন। এক্ষেত্রে তিনি এই দৃঢ় সিধান্তে এসেছেন যে, উপরোক্ত পদক্ষেপ দুটি স্বার্থকভাবে রুপায়িত হলে নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস পেতে বাধ্য আর সেই সঙ্গে কমবে কন্যা শিশুর মৃত্যুর হার। উন্নতি ঘটবে নারীর খাদ্য, পুষ্টি, চিকিৎসার ক্ষেত্রেও। এক কথায় নারীর ক্ষমতায়নের ছবিটি ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে উঠবে।

অমর্ত্য সেনের তত্ত্ব কাঠামোর ওপর ভর করে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ সম্পর্কে সারা বিশ্বেই এক দশক ধরে চলছে বিভিন্ন আর্থসামাজিক গবেষণা। এর মধ্যে বিশেষেভাবে উল্লেখ্য স্বাধীনতার, বিভিন্ন রূপ, স্বক্ষমতা, স্বত্বাধিকার ইত্যাদি বিষয়। একদা ক্ষমতাহীন নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে ক্ষমতাকে তিনটি ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত করেছেন অনেক বেশি সংখ্যক। এগুলি হল ‘Power to’ ‘Power with’ ও ‘Power within’ অর্থাৎ নিজের বেঁচে থাকার ক্ষমতা নিজের শ্রমশক্তির স্বার্থক প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা ইত্যাদি।[79] Power with হল নারীদের যৌথ ক্ষমতা প্রয়োগের দিকটি এবং Power within-এ নিহিত রয়েছে লিঙ্গ ভিত্তিক আত্মমর্যাদা বিকাশের প্রসঙ্গটি। অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন মূলত যে তিনটি প্রশাখায় পল্লবিত হতে পারে যে গুলি হল ক)

---

[79] সুলতানা মোসতাফা খাতম, বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নঃ মিথ এবং বাস্তবতা, ঢাকা ২০০৩, পৃ ৮২-৮৩

অর্থনৈতিক খ) সামাজিক গ) রাজনৈতিক। ক্ষমতায়নের এই তিনটি প্রসঙ্গে একদিকে যেমন স্বতন্ত্র, অন্যদিকে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ও বটে।

নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নঃ-

দারিদ্র মোচন সম্ভব না হলে সাধারনভাবে ক্ষমতায়নের প্রশ্নই অবান্তর। নারীদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা যে অন্যতম তা বলাই বাহুল্য। আদর্শ অর্থনৈতিক মডেলের সফল প্রয়োগের মধ্যদিয়ে নারী যে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ এশিয়ায় তাঁর অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বিশেষেভাবে বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও ভারতে স্বয়ম্ভর প্রকল্প তাঁর অন্যতম প্রমাণ। বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মোট সদস্যের ৯৫% মহিলা, তেমনি ভারতেও স্বয়ম্ভর ব্যাঙ্ক লিঙ্কেজ প্রকল্পের সিংহভাগ সদস্যই হলেন মহিলা।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে বিভিন্ন মডেলে ক্ষুদ্রঋণ মহিলাদের জীবনের মধ্যে এনেদিয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক বিপ্লব। ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ স্বয়ম্বর গোষ্ঠী ও স্বয়ম্ভর ব্যাঙ্ক সংযুক্ত প্রকল্প প্রায় ৪২ কোটি দরিদ্র পরিবারকে দারিদ্র মুক্ত করেছে।[৪০] এছাড়াও নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি অর্থনৈতিক মডেল সারা বিশ্বে খুব জনপ্রিয়। এগুলি হল দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প, গ্রামীণ নারী শিশু উন্নয়ন প্রকল্প, এবং সমবায় উন্নয়ন সংস্থা। এই প্রকল্পগুলির বিশেষ অবদান হল নারীকে নিছক বেতনভোগী হিসেবে নয়, বরং বহু ক্ষেত্রে এই অবস্থা থেকে নারী ও তাঁর সংশ্লিষ্ট পরিবারকে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সরে আসার পথ দেখিয়েছে।

---

[৪০] ভব রায়, যোজনা, নারীর ক্ষমতায়নের একটি পর্যালোচনা, ২০০৮ পৃ, ৬।

নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নঃ-

একথা প্রনিধান যোগ্য যে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি। তবে আর্থিক ক্ষমতায়ন মানে সামগ্রিক ক্ষমতায়ন নয়, পারিবারিক তথা সামাজিক ক্ষমতায়নের যেমন কিছু কিছু নির্দিষ্ট পরিমাপক রয়েছে, তেমনি তাঁর একটি অনুকুল পরিমন্ডলে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। পুরুষের স্বাপেক্ষে পারিবারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা, ঘরে বাইরে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যাওয়া আসার ব্যপারে তাঁর স্বাধীনতা। এছাড়াও অন্যান্য যে সব পরিমাপকগুলি বিবেচিত হয়ে থাকে সেগুলি হল- পুত্র কন্যা সন্তানের পড়াশোনার ব্যপারে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি, সাধারনভাবে শিক্ষা, গনমাধ্যম, কর্মসংস্থান, সামাজিক মেলামেশা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকারের সীমারেখা। বিশেষত ভারতীয় পটভূমিতে আজও নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা স্বরুপ যুগ যুগান্তরের সামাজিক ঐতিহ্যের বিষয়কে ও মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এই ঐতিহ্যটিকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন সমাজতাত্ত্বিক কাঞ্চন মাথুর "Women also consciously, discipline themselves to the bearers of tradition, Harmony and familial social honour.The female body therefore, becomes the edifice on which gender in equality is built and legitimized. Hence, negating the self in cause of the family/Community becomes he prime concer responsibility. Throughout her life cycle she is socialiesed, into acpeting her 'lower' status. Even if she is subjected to extreme discrimination or physical violence, she accepts it as her fate [EPW.APRIL TO MAY 2008]। এই তাত্ত্বিক

অভিমত থেকে বুঝে নিতে হয় পূর্বোক্ত সামাজিক ঐতিহ্যের বেড়াজাল কম বেশি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে না পারলে নারীর ক্ষমতায়ন নির্দিষ্টভাবে সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন/ রাজনৈতিকঃ-

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি যুগপৎ সাধারন আর্থিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণের ওপর নির্ভরশীল। পঞ্চায়েত, পৌরপ্রশাসন-সহ তৃনমূলস্তরেগত দুই দশকে নারীর অধিকতর আনুপাতিক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় রাজনীতি ও সিধান্ত গ্রহনে নারীর সীমিত উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তা থেকে উত্তরনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করে ব্যপক পরিসরে কৌশল নির্মাণের কথা বলেছে। রাজনৈতিক সিধান্ত গ্রহনে সমান অংশ গ্রহন নারীর অগ্রগামিতায় মূল ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। আরও বলা হয় নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সিধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহন, নারীর সমঅংশ গ্রহনের একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। এই কারনে ভারতীয় সংবিধানে ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনী সূত্রে স্থানীয় ও পৌর স্বায়ত্বশাসনে নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত দুটি বিষয়, পার্লামেন্টের নারীর প্রবেশ যোগ্যতা ও নারীর ইস্যুর প্রতি রাজনৈতিক দলের অবস্থান নারীর ক্ষমতা ও সম অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ দুটি ক্ষেত্রে নারীর জোরাল উপস্থিতি প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়নের সাথে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় জড়িয়ে আছে। এই উপাদানগুলি নারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা ধারন করে রাজনৈতিক সিধান্ত গ্রহনকারী ক্ষেত্রসমূহ। নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির প্রয়োজন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহন। কেননা নারীর প্রয়োজন ও নারীর পরিপ্রেক্ষিত যথাযথভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা

নারীর তাঁর জীবনে ও অভিজ্ঞতার আলোকে ধারন করে থাকে। এখানেই নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহনের পারস্পারিক সম্পৃক্তই, কিন্তু এই দুটিক্ষেত্র খুব সামান্য হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি।

নারীর ক্ষমতায়নে বিবেচ্য বিষয়ঃ-

নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহনের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিধিতে বৈচিত্র লক্ষণীয়, জেন্ডার কর্মপরিকল্পনায় এই বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় আনা জরুরি।[81] নারীর ক্ষমতায়নের ধারনা ও কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হচ্ছে –ক) উন্নত ও অনুনত দেশের বৈষম্যমূলক অবস্থান এবং অবস্থান থেকে উদ্ভুত ধারনাগত বৈপরীত্য অথবা ভিন্নতা খ) জাতীয় পরিধিতে উৎপাদন সম্পর্কের বৈষম্যমূলক প্রেক্ষাপটে নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থানের তারতম্য গ) ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ধারনা বা ভিন্নতা ঘ) তুলনা মূলকভাবে অনুন্নতদেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থান। ঙ) পুঁজিবাদী বিশ্বের যুদ্ধ উন্মাদনা ও আর্থিক সংকটের দরিদ্র মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে আরও অনিশ্চিত , আরও সংকটপূর্ণ এরকম পরিস্থিতির তৃনমূল পর্যায়ে নারী ও শিশুরাই আক্রান্ত হয় বেশি। অসম এই ব্যবস্থায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির আন্দোলন, নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

সার্বিকভাবে বলতে গেলে উপরিউক্ত বিষয়গুলো নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসাবে পরিগনিত হয়ে থাকে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে- ক) পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শে ও নারীর অধস্তনতার অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ এবং

---

[81] চিররঞ্জন সরকার, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন , চ্যালেঞ্জ ও করনীয়, ঢাকা, মার্চ ২০১০, পৃ ১৭-১৮

রুপান্তর করা। খ) কাঠামো, ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান- যা নারীর প্রতি বৈষম্যকে সমন্বিত ও জোরদার করে তা পরিবর্তন করা। যেমন- পরিবার, শ্রেণী, জাতি বর্ণপ্রথা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম, আইন এবং উচ্চ-নিচ উন্নয়নের মডেল ইত্যাদি সহ সবকিছু রুপান্তর করা। গ) বস্তুগত সম্পদ ও জ্ঞান সম্পদের অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষের বিরুদ্ধে নয় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর সকল প্রকার প্রকাশের বিরুদ্ধে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষকে ও মুক্ত করবে, তারা নির্যাতক ও শোষককারীর ভূমিকা থেকে মুক্তি পাবে। বিদ্যমান সমাজের পুরুষের দায়িত্ব বলে যে সকল কাজ আছে সেই সকল কাজ থেকে মুক্তি পাবে, এতে পুরুষরা ও গৃহকাজ এবং শিশুপ্রতিপালনে অংশ নেবে, বিনিময়ে নারীরাও পুরুষের কাঁধে চাপান সনাতন দায়িত্ব পালনে অংশ নেবে।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াঃ-

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া যে সকল বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন সেগুলি হল-ক) সচেতনতার স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন পক্রিয়া শুরু হয় নারীর মনে। খ) বাইরের শক্তির দ্বারা অবশ্যই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে উতসাহিত করতে হবে। গ) ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া যৌথভাবে শুরু করতে হবে। ঘ) নারীর ক্ষমতায়নে উচ্চ-নিচ বা এক মাত্রিক প্রক্রিয়া হতে পারে না। ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া অবস্থা অবস্থান পরিবর্তনের জন্য হতে হবে। চ) রাজনৈতিক শক্তিতে রুপায়িত না হওয়া পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন সমূহকে রুপান্তর করতে পারে না। ছ) নারীর ক্ষমতায়ন বিদ্যমান ক্ষমতা ধারনা ও পরিবর্তন করবে।

সচেতনতার স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় নারীর মনেঃ -

মতাদর্শ হচ্ছে অন্যান্য ক্ষমতা কাঠামো টিকিয়ে রাখার কেন্দ্রীয় শক্তি, তাই সচেতনতারস্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় তাঁর মনে। নারীর নিজের সম্পর্কে তাঁর অধিকার, স্বক্ষমতা, ও স্বম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হয়। লিঙ্গ ও অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ কিভাবে নারীর ওপর কাজ করছে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া। শিশুকাল থেকে নারীর মধ্যে নিচতার যে বোধ মুদ্রিত করা হয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়া। নিজের শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতাকে নিজের ভেতর থেকে স্বীকৃতি দেওয়া, সর্বপরি তাঁর যে সম্মানিত হবার অধিকার আছে তা বিশ্বাস করা এবং বুঝতে সেখা যে তাকে এবং ওপর নারীদের এ অধিকার আয়ত্বও করতে হবে, কেননা যারা ক্ষমতাধারী তারা স্বেচ্ছায় ক্ষমতাদেবে না।

বাইরের শক্তি দ্বারা অবশ্যই ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে হবেঃ-

ক্ষমতাহীন ও নিপীড়িতদের ক্ষমতা এবং অধিকারের দাবী জানাতে হবে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে অধস্তন অবস্থানে নারীরা রয়েছে, তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের অধিকারের দাবী নাও করতে পারে। কারন বিদ্যমান অধস্তনতার মতাদর্শের দ্বারা তারা প্রভাবিত। সামাজিক প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্যকে নারী স্বভাবিকভাবে গ্রহন করে। সুতরাং বাইরের শক্তি দ্বারা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে হবে। এই শক্তির নানা রুপ হতে হবে, শুধু মাত্র এই নয় যে, তাদের নারীর আধিকারকর্মী নারী সংগঠন বা এন, জি, ও হতে পারে। এক্ষেত্রে দরিদ্র নারীদের সংগঠন ও প্রভুত ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষা পরিবর্তনের অন্যতম প্রতিনিধি হতে পারে।

ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া যৌথভাবে শুরু করতে হবেঃ-

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া যৌথভাবে শুরু করতে হবে। ইতিহাসে আমরা দেখি যে, একজনের অবস্থানের পরিবর্তন হলেই সকল নারীর অবস্থান পরিবর্তন হয় না। সবসময় এমন নারীরা ছিলেন যারা তাদের সময়ের বাধাকে অতিক্রম করে গেছেন। যেমন রাজিয়া সুলতানা, রানি লক্ষ্মী বাঈ, বেগম রোকেয়া এবং আরও অনেকে কিন্তু তারা সকল নারীর জন্য স্থায়ী কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। এছাড়া যখন একজন বা দুজন নারী সমাজের প্রচলিত ধারা ভাঙ্গে তখন সমাজ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু যদি একসাথে অনেক কোন পরিবর্তন দাবী করে তবে সমাজের জন্য যে দাবী অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে কারন গোষ্ঠীর ক্ষমতা সবসময় একজন ব্যক্তির ক্ষমতার চেয়ে বড়।

ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এমন যেখানে নারী যৌথভাবে তাদের নিজের জন্য সময় এবং স্থান তৈরি করে, যেখানে তাদের জীবনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে ও নয়া সচেতনতা তৈরি করতে পারে। পুরুষের কতৃত্ব এবং সংসারেও বিছিন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে এই স্থান ও সময় নারীকে পুরনো সমস্যা নতুন ভাবে দেখতে, তাদের পরিবেশ ও অবস্থা বিশ্লেষণ করতে সেখায়। তারা তাদের শক্তি, অনুধাবন করে নতুন ধরনের তথ্য ও জ্ঞানে তারা অভিগ্যম্যতালাভ করে এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদে নিয়ন্ত্রণ গ্রহনের ক্ষেত্রে উদ্যোগী করে তোলে।

নারীর ক্ষমতায়ন ওপর-নিচ বা এক মাত্রিক হতে পারে নাঃ-

নারীর ক্ষমতায়ন কোন বৃত্তে সীমিত থাকতে পারে না। এটি গতি ও পরিবর্তনের মাধ্যমে চক্রাকারে উচ্চতরস্তরে উন্নীত হয়। সচেতনতা সমস্যা চিহ্নিত করন। পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপ ও তাঁর ফলাফল নারীকে উচ্চস্তরে সচেতনতা এবং কার্যকর ও সম্পাদিত কৌশলের

দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই ক্ষমতায়নচক্র পরিবর্তনের প্রতিনিধি, যৌথ নেতৃত্ব এবং পরিবেশকে সমমাত্রায়ায় না হলেও প্রভাবিত করে । তাই ক্ষমতায়ন ওপর নিচ বা এক মাত্রিক প্রক্রিয়া হতে পারে না। ক্ষমতায়ন কেবল মানসিক অবস্থার পরিবর্তন নয়, এই পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রকাশ ও থাকতে হবে। ক্ষমতায়ন মানে হচ্ছে সবসময় পছন্দ থাকা এবং পছন্দ করার ক্ষেত্রে নারীর স্বক্ষমতা তৈরি করা।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য হতে হবেঃ-

ক্ষমতার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে। কেউ নারীর তাৎক্ষনিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগী হয়, কেউ বা কাঠামোগত আসমতা যা এই সকল সমস্যা তৈরি করেছে তাঁর বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল। এই সমস্যাকে তাই অনেক নারীবাদী সমাজবিদ নারীর অবস্থা এবং অবস্থান এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর বলেছেন, অবস্থা হচ্ছে বস্তুগত, যার মধ্যে একজন দরিদ্র নারী বসবাস করে – যেমন নিম্ন মজুরী, অপুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। অন্য দিকে অবস্থান হচ্ছে পুলিশের তুলনায় নারীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মর্যাদা। বেশিরভাগ নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থার পরিবর্তনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু নারীর ক্ষমতাহীন এবং অসমতার যে কাঠামো তা পরিবর্তনে ততপর দেখা যায় না। এতে তাদের অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হলেও অবস্থান একই থেকে যায়। তাই নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য হতে হয়।রাজনৈতিক শক্তিতে রুপায়িত না হওয়া পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন সমাজকে রুপান্তর করতে পারে নআ।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নারীর ক্ষমতায়ন সমাজকে পরিবর্তন করতে পারবে না, যতক্ষণ না এটি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত না হয়। এর অর্থ হচ্ছে, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে সংগঠিত

গনআন্দোলনে রুপায়িত হতে হবে, যা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং রুপান্তর করবে।

নারীর ক্ষমতায়ন বিদ্যমান ক্ষমতার ধারনার পরিবর্তন করবেঃ-

ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন বোধের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্ষমতা মানে ব্যক্তিগত প্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রণ বা শোষণ নয়। পুরুষ শাসিত শ্রেণী বা সমাজের ক্ষমতার এই প্রচলিত ধারনা তৈরি হয়েছে। এটি ধ্বংস মূলক ও নিপীড়ন মূলক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যা নারী পুরুষ উভয়কেই প্রতিযোগিতা এবং দুর্নীতি করতে উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা মানে অংশগ্রহন, আদান প্রদান, সকল মানবের সম্ভাবনার বিকাশ ও উন্নয়ন।

সুতরাং বলা যায় যে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে এই পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজের যেভাবে স্বার্থবাদী হয়ে পড়েছে এবং পরিবেশের ক্ষতি করে সম্পদ ব্যবহার করে চলছে তেমনি ভাবেই নারী ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হোক। নারীর ক্ষমতায়নের দ্বারা বিশ্বকে এমন দিকে ধাবিত করা উচিত যেখানে নারী এবং সচেতন পুরুষকে নিশ্চিত করতে হবে, যে সম্পদ কেবল সুষমভাবে ব্যবহৃত হবে নিরাপদ ভাবে ব্যবহৃত হতে হবে সর্বত্র মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে পারলে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হবে। প্রয়োজন কেবল স্বদিচ্ছা, অঙ্গীকার আর সুনীতির। নারীর ক্ষমতায়ন তখন কেবল মুখের বুলি হিসেবে থাকবে না, প্রায়োগিক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থাপিত হবে।

অতএব সবশেষে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা পশ্চিম মেদিনীপুরে নারী ক্ষমতায়নে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। আমি দেখি যে, নয়াগ্রামের মাতঙ্গিনী ও ভাই ভাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রাধারানী জানা, ঝাড়গ্রামের অরন্য সুন্দরী সহায়ক গোষ্ঠীর শবর মেয়েরা ও

নারায়নগড়ের দহরপুরের লোধা উপজাতির মেয়েরা কিন্তু নিজেদের চেষ্টায় স্বনির্ভর হয়ে ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে। তাই রাধারানী তাঁর দুই ছেলেকে হোস্টেলে রেখে পড়ানোর সামর্থ-ই হোক আবার শালপাতা বিক্রির জন্য ওড়িশার বালাসোর থেকে এদিকে কলকাতা যাওয়ার ঘটনা কিন্তু নারী ক্ষমতায়নেরই পরিচয় বহন করে। তবে আমি দেখি যে, এই স্বনির্ভরগোষ্ঠী সম্পর্কে সাধারন দরিদ্র মানুষ গুলিকে বেশি করে সচেতন করাতে হবে। কারন গ্রামের বেশিরভাগ পড়াশোনা না জানা দরিদ্র মানুষ-ই কিন্তু ব্যাঙ্কের সম্পর্কে ভুল ধারনা তৈরি করে ফেলে আবার অনেকে জাতপাতের সমস্যার জন্য স্বনির্ভরগোষ্ঠী করতে চায় না। তবে এই গোষ্ঠীর মধ্যে যদি সমস্ত দরিদ্র মানুষকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসা যায় তাহলে সত্যিই একদিন দরিদ্রমুক্ত ভারত গড়া সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

1। সরকার, চিত্তরঞ্জন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়, মার্চ ২০১০।

2। এম, এম আকাশ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা- চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরনের উপায়। উন্নয়ন পদক্ষেপ, মার্চ, ২০০৮।

3। Enayetullah Khan, “Women in politice” Lecture Series-2, Women and politics in Banglades, Centre for women and development (CW) Bangladesh, May 1999.

4। M. Margaret Conway, ‘Women and political purticipation’ps political science and politics, Washington,. June 2000, p.-3

5, Michel Foucault, the subject and power, power, London 2001.

6, Chen M. Conceptual Model for women’s Empowerment, Seminar paper, organized by the Save the children USA, 1990.

7, Sen , A.K. and nassbaum M.e.(ed): capability and well-being in the qualify of life , 1993.

8, Mondal, S.R. status of Himalayan Women empowerment Vol.6 1999 p.40-45

9, Khanum , S.M. Gateway to Hell: The Impact Of Migration on Bangladeshi Women's Territory; Position and Power in England , Empowerment Vol-6, 1999, p.1-16

10, Mayoux. L: The Magic Ingredient? Microfinance and women's Empowerment, A briefing paper prepared for the Microcredit summit, Washington 1997.

11, Kabeer, N, Gender Equality and Women's Empowerment , A Critical analysis of the Third Millennum Development Goal, Gender and Development March 2001.

12, Malhotra, A . Schuler Sr and Boender , Carol, 2002; Mesuring Women Empowerment as a Variable in International Development , Background paper for World Bank workshop on poverty and Gender, 2002

13, Kabeer, N. is Microfinance a "Magic Bullet" for women's Empowerment , Analysis of Finding from South Asia, Economic and Political weekly, 29 october, 2005

14, Development Alternative with Women for a New era (DAWN) An International organization form out of the Development Decade is a Network of Femirist Activists, Researches and policy makers from the South.

উপসংহারঃ মুল্যায়ন ও সুপারিশ

আমি আগের অধ্যায়গুলিতে দেখিয়েছি যে, কীভাবে সমবায় ভাবনা ও সমবায় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গ তথা পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলি গ্রামীণ মানুষের দরিদ্র দূরীকরণ কীভাবে কাজ করে চলেছে। ‘পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ইতিহাস আলোচনা: পশ্চিম মেদিনীপুরের স্বনির্ভরগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সমীক্ষা;’ নামক গবেষণায় বিষয়বস্তু, প্রাপ্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরন, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমি আমার গবেষণার অধ্যায়গুলিকে একত্রিত করে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা এবং সেক্ষেত্রে আমি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি প্রকাশ করব। যার মধ্যে দিয়ে উঠে আসবে বিভিন্ন প্রশ্ন। যেগুলি বর্তমান সমাজের সাধারন গ্রামের দরিদ্র মানুষের জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকগুলি। আবার এই গবেষণার ফলে কিছু গ্রহনযোগ্য নীতির নির্দেশ করা হয়েছে। যা কিনা পরবর্তী গবেষণায় কাজে লাগবে।

উক্ত গবেষণার প্রথমেই যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির উল্লেখ করে সমগ্র গবেষণাটির একটি সুনির্দিষ্ট দিক ও নির্দেশ করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি যে, প্রাচীন যুগ থেকে মানুষরা কীভাবে নিজের অজান্তে-ই গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করেছিল নিজেদের আত্মরক্ষা থেকে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে, এই গোষ্ঠীবদ্ধতা বা সমবায়ের একটি দার্শনিক ভিত্তি ও আছে তার ফলে এই ভিত্তিটি আবার কতকগুলি ধারনার ওপর ভর করে গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক ভিত্তি ও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এবং পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ সহ আরও অনেক মনীষী কীভাবে সমবায় দর্শনের ওপর ভিত্তি করে সাধারন মানুষকে ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন থেকে মুক্ত করার প্রয়াস নিয়েছিল তাও আলোচিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি হওয়া সমবায় আইন এবং এর ফলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কমিশনগুলিকে আমি আমার গবেষণায় তুলে ধরেছি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে ওঠা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমেও সরকার এই সমবায় সমিতির মধ্যে দিয়ে সাধারন মানুষের কী কী উন্নতি ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছিল তাও আলোচিত হয়েছে। ১৯৯০ এর দশকের পরে বিশেষভাবে মুক্তঅর্থনীতির প্রভাব কতখানি ভারতের সমবায় অর্থনীতির ওপর পড়েছিল তাও দেখানোর চেষ্টা করেছি। এবং বিগত তিন দশকেও সমবায় সমিতিগুলির ক্ষেত্র কীভাবে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গঠনের মধ্যদিয়ে বিস্তারলাভ করলো তা পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রেক্ষিতে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে এই প্রশ্নগুলি পরবর্তী গবেষণায় আসবে যে,-১) মনীষীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা স্বনির্ভর দলগুলি কতখানি সমাজের গরীব মানুষের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল ? ২) এই স্বনির্ভর দলগুলির ওপর ঔপনিবেশিক সরকারের মনভাব-ই বা কেমন ছিল ? ৩) ঔপনিবেশিক সরকারের তৈরি করে দেওয়া কমিটিগুলি কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারত। প্রভৃতি বিষয়গুলি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি 'পশ্চিম মেদিনীপুর ও স্বনির্ভরগোষ্ঠী' তে আলোচনা করেছি গোষ্ঠী সম্পর্কে মানুষের সাধারন ধারনা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংজ্ঞা, ভারতে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর পথ চলা, ভারতবর্ষের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর তুলনা মূলক আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শ্রী মতি এলা ভাটের সহায়তায় গুজরাটের 'Self help Employed Nomen's Association'(1972) থেকে কর্ণাটকের ১৯৬৮ সালে তিব্বতি রিফিউজিদের পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'Mysore Resettlement and Development Agency' যা পরবর্তী সময়ে ব্যাঙ্কের মর্যাদা পায়। এর সাথে ভারতে প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন বড় বড় মাইক্রফিনান্স প্রতিষ্ঠান গুলিকেও আলোচনা করা হয়েছে। আবার ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ উন্নয়নে নাবার্ড ও স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনার ও

তুলনা মূলক আলোচনা করেছি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জেলা ভিত্তিক স্বনির্ভরগোষ্ঠীর একটি টেবিল ও গোষ্ঠী কাঠামোর গঠনের সাথে সাথে তার লক্ষ্য গুলিকে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর সহ সারা রাজ্যের জেলাগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকার-ই বা সেগুলিকে কিরকম মনোভাব নিয়ে দেখেছিল তা ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর সহ সারা রাজ্যের জেলাগুলিতে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলি কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকার-ই বা সেগুলিকে কি রকম মনোভাব নিয়ে দেখছে তাও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের বিশেষ কতগুলি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মধ্যে নয়াগ্রাম ব্লক ও ঝাড়গ্রাম, নারায়নগড় ব্লকের বিশেষ তিনটি স্বনির্ভরগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই গোষ্ঠীগুলি কীভাবে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার আলো দেখিয়েছিল তা ও আলোচিত হয়েছে। এখানে পরবর্তী গবেষণায় প্রশ্ন হবে যে- ১) এখানকার স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলির মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারির পার্থক্য কি ? ২) এই গোষ্ঠীগুলি গ্রামীণ মহাজনী অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দিয়ে কত খানি স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারছে এবং পুঁজি উৎপাদনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। প্রভৃতি বিষয়গুলি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কীভাবে নারী স্বনির্ভরতার মধ্যে দিয়ে নারী ক্ষমতায়ন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা পশ্চিম মেদিনীপুরের। প্রথমে আলোচিত হয়েছে ক্ষমতায়নের ধারনা, ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকদের মতামত, ক্ষমতায়ন পদ্ধতি, ও ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত। নারী ক্ষমতায়নের বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন- সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ছাড়াও নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে সচেতনতার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তা ও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। পরে আবার আলোচনা করেছি যে, ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কীভাবে বাইরের শক্তি গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে আমি দেখিয়েছি পশ্চিম

মেদিনীপুরের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে ক্ষমতায়নের ফলে নারীরা সমাজে কতখানি ভালো ভাবে জীবন যাপন করতে পারছে। এক্ষেত্রে পরবর্তী গবেষণায় প্রশ্নগুলি আসবে তা হল- ১) স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নকে পুরুষ শাসিত সমাজ কতখানি মেনে নিচ্ছে ? ২) নারী ক্ষমতায়ন সমাজ জাতপাতকে কতখানি মুছে ফেলতে পারছে ? ৩) বর্তমানে সমাজ সচেতনতা মূলক কাজে এই ক্ষমতায়ন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ?। ইত্যাদি বিষয়গুলি।

Bibliography

Report:-

বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা কো অপারেটিভ জার্নাল।

Bombay Banking Enquiry Committee Report, Vol. I, pp.86-87

The Gazette of India, March 26, 1904, Part-IV, pp. 23-24

The Cooperative Societies Act, 1904, Section 3(2)

First Five Year Plan, Planning Commission, Govt. of India, p. 41

Draft Five Year Plan (1978-83),

Planning Commision, Govt. of India, New Delhi, pp. 151-52

Ninth Five Year Plan, Planning Commision, Govt. of India, pp. 445- 462

Report: status of microfinance in india 2011-12 National bank for agriculture and rural Development , microcredit innovation department , Mumbai.p1

World Human Development Report 2011, United Nation Development Programme , Newyork, pp126,144

News Paper:-

ভট্টাচায, স্বাতী (২০০৮), “পার্টিতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্র, দুইয়ের সঙ্গে লড়ছে মেয়েরা”, আনন্দ বাজার পত্রিকা (দৈনিক), কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর, পৃ ৪

ভট্টাচায, স্বাতী (২০০৯), “এ পরিবর্তন গরীব মেয়ের রুটি যোগায় না”, আনন্দ বাজার পত্রিকা (দৈনিক), কলকাতা, ২৪ জুন, পৃ ৪

ভট্টাচায, স্বাতী (২০১১), “দারিদ্রের চেয়ে বড় ঝুঁকি আর কিছু নেই”, আনন্দ বাজার পত্রিকা (দৈনিক), কলকাতা, ৫ ই জানুয়ারী , পৃ ৪

Weekly:-

M.S Sriram. 2005. “Micro-finance and the State Exploring Areas and Structures of Collaboration.” *Economic and Political Weekly, VOL. XL NO-17.*

Mahendra P Varman. 2005. “Impact of Self-Help Groups on Formal Banking Habits.” *Economic and Political Weekly, Vol,XL No 17 .*

Muhammad Yunus. 2004. “Grameen bank, microcredit and millennium development goals.” *economic and political weekly* p4080.

N Kabeer. 2001. “ Gender Equality and Women’s Empowerment , A Critical analysis of the Third Millennum Development Goal .” *Gender and Development .*

N Kabeer. 2005. “ is Microfinance a “Magic Bullet” for women’s Empowerment , Analysis of Finding from South Asia,.” *Economic and Political weekly.*

Naila Kabeer. 2005. “ “Is Microfinance a ‘Magic Bullet’ for Women’ Empowerment? Analysis of Findings from South Asia”,.” *Economic and Political Weekly, .*

Monthly:-

অশোক কুমার কুণ্ডু. ২০০৮. “নয়াগ্রামের ঝগডি আর পাতিনার অনাবাদী জমিতে ফলবে কাজু, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা.” *পঞ্চায়েতি রাজ* (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন)

ডঃ অসীম করমকার. ২০১৯. “মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও সমবায়,.” *ভান্ডার* পৃ-২৭.

ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়. ২০১৯. “সমবায়ের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ.” *ভাণ্ডার* পৃ-২৫

দাস বাদল চন্দ্র. ২০১২. “গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সহযোগী সংস্থার লোকজন”. *পঞ্চায়েতীরাজ,* (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র) পঞ্চম সংখ্যা (পঞ্চম বর্ষ): পৃ ২২-২৩.

প্রদীপ কুমার পাঁজা. ২০১৯. “ সমবায় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সুভাষ চন্দ্র বসু.” *ভাণ্ডার* পৃ-৪৩.

প্রবীর কুমার সামন্ত. ২০১৭. “সমবায়ী মননে ভগিনী নিবেদিতা.” *ভাণ্ডার* পৃ- ১৯.

প্রবীর কুমার সামান্ত. ২০১৯. “স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয় সাধনে সমবায়.” *ভাণ্ডার* পৃ-৩৭.

প্রভাত দত্ত. ২০১২. ““পশ্চিম বঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও গরীব মেয়েরা”.” *পঞ্চায়েতী রাজ* (পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র,) পঞ্চম সংখ্যা (পঞ্চম বর্ষ): পৃ ৬.

মধুছন্দা ভট্টাচায্য. ২০১৯. “ অর্থনৈতিক সমবায়ে স্বামী বিবেকানন্দ.” *ভাণ্ডার* পৃ-৩৫.

মানব সেন. ২০০৩. “ “স্বনির্ভর দল ও সহভাগী উন্নয়ন”.” *পশ্চিমবঙ্গ গ্রামোন্নয়ন বিশেষ সংখ্যা* (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃ ১০৮.

রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়. ২০১৯. “প্রজাতন্ত্র দিবস ও সমবায় ভাবনা.” *ভাণ্ডার* পৃ-৪৭.

২০১৩. “শাল পিয়ালি অরন্য সুন্দরীর ইতিকথা.” *পঞ্চায়েতি রাজ* (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র) প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: পৃ ৩০.

শাশ্বতী ব্যানাজী. ২০১১. ““স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা”.” *পঞ্চায়েতী রাজ* (পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র) দ্বিতীয় সংখ্যা (চতুর্থ বর্ষ): পৃ ৬-৭.

শ্রী সৌরভ চাকি. ২০১২. “ “রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আন্দোলন”.” *পঞ্চায়েতী রাজ* (পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সামাচার পত্র) তৃতীয় সংখ্যা (পঞ্চম বর্ষ): পৃ ১১.

২০১৪ . “সমবায়ের ইতিহাস.” *পঞ্চায়েতী রাজ* (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নয়ন বিভাগের সমাচার পত্র,) প্রথম সংখ্যা (সপ্তমবর্ষ).

English Book:-

Ajay., Reddy, K .Raja and Harper,Malcolm Frances Sinha with Tankha. 2009. *Microfinance Self-Help Groups in India: Living up to Their Promise ?* UK: Practical Action Publishing Ltd .

Chen M. 1990. " Conceptual Model for women's Empowerment, Seminar paper, ." *organized by the Save the children USA.* New York.

Dr, N Lalitha. 2003. *Main Streaming Microfinance .* New Delhi: Mohit Publications.

Dr. Amir Afaque Ahmad Faizi. 2009. *Self Help Groups and Marginalized Communities .* New Delhi: Concept Publishing Company .

Dr. Manab Sen and Dr.Ashok Sircar. 2006. *Self-Help Groups and Microfinance in West Bangal (A Study of Evolution of the SHG-Mf sector with special reference to CARE-CASHE).* kolkata: SHG-Promotional Forum,.

Enayetullah Khan. 1999. *"Women in politice" Lecture Series-2, Women and politics in Banglades, .* Bangladesh: Centre for women and development (CW) Bangladesh.

G Karmakar .(ed) K. 2008. *Microfinance in India.* New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd.

Jaya.S Anand. 2002. *Self-Help Groups in Empowering Women:Case Stady of selected SHGs and NHGs Discussion Paper No-38.* Thiruvananthapuram: Kerala Research Programe on Local Level Development Studies.

Kalka, Srivastava. 2005. *Self Help Groups and Civil Society: A Preliminary Study .* New Delhi: , Indian Social Institute .

M. Margaret Conway. 2000. *'Women and political purticipation'ps political science and politics.* Washington: CQ Press.

Malcolm Harper. 2002. " " Grameen Bank Groups and Self Help Groups: What are the difference?"."

Manab Sen. 2005. *Stady of Self-Help Groups and Microfinance in West Bangal, State Institute of Panchayats and Rural Development (Kalyani,Nadia).* kolkata: Dasgupta and Co.Pvt.Ltd.

Study of self help groups and microfinance in west Bengal. Kolkata: SIPRD and Dasgupta and co.pvt. ltd.

Mancolm Harter. 2003. *Political Microfinance: A Training Guide for South Asia .* New Delhi: Vistar Publication.

Michael P. Todaro. 1989. *Economic Development in the Third World.* New Delhi: Pearson Education Limited,,.

Michel Foucault. 2001. *The Subject and Power.* London : New York.

Radha Kumud Mukherjee. 2018. *Local Govt.in Ancient India.* Kolkata: Creative Media Partners, LLC.

Ramesh Chandra Majumdar. 2015. *Corporate Life in Ancient India.* New Delhi: Bibliolife DBA of Bibilio Bazaar II LLC.

Ray P C. তারিখ নেই. *Essay and Discourses C H, ,.* Government and Indian Industries.

S.M. Gateway to Hell Khanum. 1999. *The Impact Of Migration on Bangladeshi Women's Territory; Position and Power in England .* Bangladesh: Empowerment.

Sagar and Ray, G.L Mondal. 2007. *Text Book of Rural Development.* Kolkata: Kalyani publishers .

T.J Jitha. 2013. *Mediating Production Re-powering Patriarchy The Case of Micro Credit Indian Jurnal of Gender Studies Vol-20.* New Delhi,June. : SAGE Publication .

Thomas Fisher and M.S. Sriram (eds.). 2002. *Beyond micro-credit: Putting development back into micro-finance.* Vistaar Publications: New Delhi.

Bengali Book:-

অখিলেশ সুর. ২০১৯. “প্রজাতন্ত্র ও সমবায় .” *ভান্ডার* পৃ-৩৩.

অমর্ত্য - সেন. ২০০৫ . *“উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা”,* . কলকাতা।: ,আনন্দ পাবলিকেশন্স, .

ইউনুস মুহাম্মদ. ২০০৬ . *গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও আমার জীবন অনুবাদ ইলা লাহিড়ী ও জয়ন্ত লাহিড়ী.* কোলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

কার্ল মার্ক্স. ১৮৬৪. *মার্কস- এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী ৫ম খণ্ড.* মস্ক: প্রগতি প্রকাশন.

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ. ১৯২৯ . *সমবায় নীতি.* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ.

বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক. ১৯৩৬. *পদ্মা নদীর মাঝি.* কলকাতা: এন্টারপ্রাইজ.

বন্দ্যোপাধ্যায় অশোক. ২০১৬,. , *সমবায় ও মানব সভ্যতা.* কলকাতা: ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো অপারেটিভস বাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড.

মঞ্জুলা বসু. ২০১৭ . *সমাজ অর্থনীতি ও রবীন্দ্রনাথ* . কোলকাতা: টেগোর রিসাচ ইনস্টিটিউট.

সরকার চিত্তরঞ্জন. ২০১০. *নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন চ্যালেঞ্জ ও করণীয়.* বাংলাদেশ: বাংলা প্রকাশ.

সারয়ার্দী হাসান. ২০১৮ . *বর্ধমান জেলায় মুসল্মান নারীদের ক্ষমতায়নে এন জি ও দের ভুমিকাঃ একটি পর্যালোচনা.* কোলকাতা: আর্থ কেয়ার প্রকাশনা.

স্বপন সিংহ. ২০০১. *স্বয়ম্বর গোষ্ঠী গঠনের ম্যানুয়েল,.* কোলকাতা,: প্রতিবন্ধী সংঘ.

বিশ্বাস বিপুল কৃষ্ণ (সম্পা.) ২০০০. *আদর্শ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ার জাদুকাঠি.* কোলকাতা: প্রতিবন্ধী সংঘ.

Articale:-

Panda Santanu(2014)Status of Women Self Helf Groups Among the Lodhas of Daharpur Village in Paschim(West) Medinipur, West Bengal, India: An Anthropological Perspective, Research Gate, January.

Research Paper:-

সরকার, বিশ্বনাথ (২০১৫), ‘স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও নারীর ক্ষমতায়নঃ গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা’ পি এইচ ডি গবেষণাপত্র, অর্থনীতি বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।